রেবেল রেডিও

শুরুর কথা

পৃথিবীর এই সঙ্কটকালে ভালো থাকার ও সকলকে ভালো রাখার চেষ্টা করি, চলুন। কথা বলি আমার-আপনার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে। জানি, বিপদের দিনে নেতিবাচক আলোচনা ভালো না লাগাটাই স্বাভাবিক। আমারও লাগে না। আমার ব্যক্তিগত মতে, জীবন বড় সুন্দর। আড্ডা, গান, বন্ধুত্ব, প্রেম, সৃষ্টি, গবেষণা, প্রকৃতি, জ্ঞান, এসবই ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের চারপাশে। সেসবের মধ্যে ডুবে থাকাতেই যেন লুকিয়ে আছে সার্থকতা, লুকিয়ে আছে শান্তি। ভোগের চেয়ে ত্যাগই বেশি গ্রহনযোগ্য, নিন্দার চেয়ে প্রশংসাতেই সুখ। কিন্তু আমি-আপনি এসবে ডুবে থাকতে পারছি কই? কিছু মুষ্টিমেয়, ভয়ানক রকমের মুষ্টিমেয় লোকজন আমাদের সুন্দর জীবনে নিয়ে আসছে নরকযন্ত্রণা। প্রতিনিয়ত। রুগ্ন হয়ে পড়ছি আমরা, দূষিত হতে হতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি সেই দূষণে। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু স্নিগ্ধ, তাই আজ আমাদের মনে সঞ্চার করছে ঘৃণা। ভিতরকার মনুষ্যত্বটুকু তিলে তিলে বিষিয়ে উঠছে সেই দূষণের প্রভাবে। যারা মনুষ্যত্বকে খুন করতে পারে, তাদের চেয়ে বড় গণহত্যাকারী ত্রিভুবনে বিরল, আর তাই এই মুষ্টিমেয় ভাগ্যনিয়ন্তাদের কুকীর্তি নিয়ে কথা বলতে আমরা বাধ্য।

> Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

এই বিখ্যাত উক্তিটি কোয়ারেন্টিনে থাকা অনেকের কাজে লেগে যেতে পারে। উক্তিটি চার্লি চ্যাপলিনের।

করোনা— অতিমারী না ষড়যন্ত্র?

বিশ্বত্রাস করোনা ভাইরাস কি আদতে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র? মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আমাদের দেশের গণমাধ্যমের মতে, এ হল চিনা ষড়যন্ত্র। গুটিকয়েক ব্যক্তি দাবী করছেন, এটা আমেরিকার ষড়যন্ত্র। মিডিয়ার বক্তব্য থেকে তো আর কিছু প্রমাণ হয় না। শুধু এটুকু বোঝা যায়, মিডিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা, আমরা, সাধারণ মানুষেরা, যেন একে চিনা ষড়যন্ত্র মনে করি। প্রাথমিকভাবে এটাই বলতে চাই, যে সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রমাণের চেষ্টা ছাড়াই মিডিয়া গুজব রটাচ্ছে, তাতে কান দেবেন না।

ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ এবং চমক লাগানোর ক্ষমতাসম্পন্ন। এমন এমন সব ঘটনা আছে যা দেখে বিরক্তি তো দূরের কথা, ভালোও লেগে যেতে পারে। ষড়যন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাও জাগতে পারে। মাথায় রাখবেন, সেই ষড়যন্ত্রই সবথেকে বড়ো ষড়যন্ত্র যা দেখতে একেবারেই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। লকডাউনের সময়ে অ্যালকোহল কিনতে কলকাতায় বড়বাজারে গেছিলাম। পেলাম না, স্টক শেষ। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, যাঁরা

স্যানিটাইজার বানান তাঁরা গ্যালন গ্যালন অ্যালকোহল কিনে নিয়ে চলে গেছেন, স্যানিটাইজারের ডিম্যান্ড বাড়বে বুঝতে পেরে। কী বলবেন এটাকে? নিশ্চয়ই বলবেন, "ষড়যন্ত্র কেন? এটা তো বিজনেস স্ট্র্যাটেজি!" ঠিক কথা। তাহলে আরেকটা উদাহরণ দিই। স্যানিটাইজারের দোকানে গিয়ে শুনলাম, বেশি দাম লাগবে। কারণ মাল আসছে না। এবার কী বলবেন? দুর্নীতি, সুযোগের সদ্ব্যবহার, না কালোবাজারি? ষড়যন্ত্র-ষড়যন্ত্র গন্ধ থাকলেও ঠিক ষড়যন্ত্র বলা যায় না। ঠিকই। তবে আরও একটা উদাহরণ দিই, আলুর কারবারীরা, অর্থাৎ আড়তদাররা, অপেক্ষা করে কখন দাম বাড়বে আর ঠিক তখনই গুদাম থেকে তারা আলু ছাড়বে। এটাকে কী বলবেন? বোধহয় ষড়যন্ত্র বলে খানিকটা মেনে নেবেন। কারণ, এক্ষেত্রে সুযোগের সদ্ব্যবহার নয়, সুযোগটাই জোর করে তৈরী করা হল। অবশ্য আলুর কারবারীকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে কখনোই বলবে না যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে দাম বাড়াচ্ছে। বরং বলবে, সে অপেক্ষা করছে দাম বাড়ার। অর্থাৎ, ভাববাচ্যে। অথচ আপনি নিশ্চিত জানেন ওটা ভাববাচ্যে নয়, কর্তৃবাচ্যে হবে— বাজারে কৃত্রিমভাবে সঙ্কট তৈরী করে দাম বাড়াচ্ছি। জটিল হয়ে গেল তো? ষড়যন্ত্র একটা হয়েছে তা বোঝা গেল, কিন্তু ষড়যন্ত্রী কে? একটা বাজার, একটা বিমূর্ত কিছুকে ষড়যন্ত্রী বলবেন কি? যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে ষড়যন্ত্রও করতে পারে আর যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার কাছে এ শুধু বাজারের লীলাখেলা। বড়ো বড়ো কোম্পানি ছোট কোম্পানিদের গিলে ফেলে এমনই লীলাখেলায়। সফটওয়্যারের ভাইরাস তৈরী করা হয় যে ল্যাবে, সেখানেই আগে থেকে তৈরী করা থাকে অ্যান্টিভাইরাস। দুই শত্রু রাষ্ট্রকে (ভারত ও পাকিস্তানের কথাই ধরুন) যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে একই অস্ত্র নির্মাতা, একই বাজার। এখন, যুদ্ধ লাগে বলে অস্ত্র বিক্রি হয় নাকি অস্ত্র বিক্রি হয় বলে যুদ্ধ লাগে, সেটাই গুলিয়ে যাবে আপনার। ডলারের দাম উঁচুতে রাখতে আর তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমেরিকা বিশ্বজুড়ে প্রচারে নামবে সাদ্দামকে সন্ত্রাসবাদী বলতে। যুক্তি হবে, জীবাণু বোমা অ্যানথ্রাক্সের আতঙ্ক। যে লাদেনকে তৈরী করে, সে-ই একদিন লাদেন বধে বিশ্বযজ্ঞ শুরু করে। সময়ের অভাবে সব কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে না পারলেও এটুকু স্পষ্ট করে তুলতে চাই যে ষড়যন্ত্র কোন অলীক বিষয় নয়, তা আধুনিক মানবসভ্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ষড়যন্ত্র করা বা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো যাদেরই কাজ হোক, আমার-আপনার যে নয় এটা নিশ্চিত। আমাদের এখনো সূর্যোদয় দেখতে ভালো লাগে, আজ যাকে গালি দিই কাল তারই দুঃখে কেঁদে ফেলি। তাই আমাদের কোনও দায় নেই করোনা অতিমারীকে চিনা বা আমেরিকান ষড়যন্ত্র বলে দাগিয়ে দেওয়ার। দায় নেই ভারতীয় গণমাধ্যমের নিরন্তর প্রোপাগান্ডার স্রোতে ভেসে তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলা। তবে আমরা মানুষ, উটপাখি নই। তাই ষড়যন্ত্র যদি কোথাও হয়, তা বোঝার প্রয়োজন ও দায়িত্ব, দুইই আমাদের আছে। কেননা দিনের শেষে ষড়যন্ত্রের ভুক্তভোগী মানুষকেই হতে হয়। আজকের আমেরিকা-চিন, বা আগামীদিনের সুপারপাওয়ার যেই হোক না কেন, সুপারপাওয়ারের ইতিহাসে লেগে থাকে মানুষের রক্ত। সবসময়। এই সাধারণ জীবন-অভিজ্ঞতাটুকু আমাদের নিজেদের জন্য বড্ড গুরুত্বপূর্ণ। গত ৭০ বছরের বিশ্ব ইতিহাসে আমেরিকার ভূমিকা চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেয়, সুপারপাওয়ার হওয়ার জন্য কতটা আগ্রাসী, ষড়যন্ত্রী, হিংসাত্মক ও রক্তলোলুপ হতে হয়। চিনও হেঁটেছে, হাঁটছে সেই পথ ধরেই। কিন্তু আমার-আপনার আজও সূর্যোদয় দেখতেই বেশি ভালো লাগে। কারণ

সূর্যোদয়ের লালে স্নিগ্ধতা আছে, লক্ষ মানুষের হাহাকার নেই।

চিন-আমেরিকা বাকযুদ্ধ, নাকি অন্য কিছু?

বক্তব্য রাখা শুরু করার আগে মা সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে মা লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ জানাতে চাই। সবাই মন দিয়ে শুনবেন। এ কথা সত্যি যে মা সরস্বতীর বিবেচনাবোধ কিঞ্চিৎ সমালোচনার যোগ্য। সভ্যতার শুরু থেকে সবাইকে তিনি একভাবে ধরা দেননি। কোনো জাতি কোনো জ্ঞানের সন্ধান আগে পেয়েছে, তো বাকিরা অনেক পরে। কেউ আগে কৃষিকাজ শিখেছে তো কেউ আগে বীজগণিত। কেউ আগে ইঞ্জিন বানিয়েছে, তো কেউ আগে পেয়েছে সমুদ্রপথের খোঁজ। এতদসত্ত্বেও মা সরস্বতীকে দোষ দেওয়া যায় না বিশেষ। যে-ই আগে জেনে থাকুক না কেন, পরিশ্রম করলে সেই জ্ঞান বাকিদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। দেরীতে হলেও জ্ঞান অর্জনের রাস্তা খোলা ছিল সবারই জন্য। কিন্তু মা লক্ষ্মী? তাঁর বিবেচনাটা দেখুন একবার! সপ্তদশ শতকে শিল্প-বিপ্লবের কৃপাধন্য ইউরোপীয় গোরাসাহেবরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক এগিয়ে যায় বাকি পৃথিবীর থেকে। কিন্তু কোনো এক রহস্যে সেই থেকে আজ অবধি মা লক্ষ্মীর স্থায়ী বসবাস পশ্চিমী দুনিয়ায়। আর্থিকভাবে বলশালী এই প্রথম বিশ্বের আধিপত্য কাটিয়ে যে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেনি, তা নয়। করেছে। কিন্তু হয় তারা খুব নিন্দিত হয়েছে বিশ্বমহলে আর নয়তো ব্যর্থ হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশের সমষ্টিতে গড়ে ওঠা মহাদেশগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ হলেও যে ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয়, শিল্প, অর্থনীতি, বাহুবল, সবকিছু মিলিয়ে মা লক্ষ্মী কিন্তু সেই মধ্য-পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার প্রতিই পক্ষপাতদুষ্ট। কী দোষ বাকি এতগুলো দেশের যারা জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর? এটাই কি এ বুড়ো পৃথিবীর নবম আশ্চর্য নয়?

আসুন, আরো একটু খুঁটিয়ে দেখি মা লক্ষ্মীর এই অদ্ভুত আচরণকে। মা সরস্বতী ১৫০০-১৬০০ সালের দিকে ইউরোপের প্রতি সদয় হন। যার জোরে ইউরোপ অর্থনৈতিকভাবে সবল হতে শুরু করে। আর উপনিবেশ বিস্তার করে সেই অর্থনৈতিক শক্তিকে বিপুল জোরালো করে তোলে। তার সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক চেহারাটা এমন ছিল যে বহুল শ্রুত বাক্য অনুসারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হত না। কিন্তু তারপরে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে এলেও পশ্চিমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারল না কোনওদিন। কেন পারল না? এটাই মা লক্ষ্মীর কাছে আমাদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন। পশ্চিমী দুনিয়ার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপনিবেশের হিসেব বাদ দিলে শিল্প উৎপাদনে বহুবছর ধরে আমেরিকা পৃথিবীর এক নম্বর দেশ। সেই কবে থেকে জানেন? ১৮৯৫ সাল থেকে। মানে আমাদের অনেকেরই ঠাকুরদার ঠাকুরদা তখন বেঁচেছিলেন। সেই তবে থেকে শিল্প উৎপাদনে আমেরিকাই প্রথম। পশ্চিমী হিসেবেই ফার্স্ট বয় প্রথম ধাক্কা খেল ২০১০ সালে। কী রাগই না হয়েছিল আমেরিকার! পশ্চিমী মিডিয়ায় একেবারে শিরোনামের ঝড় বয়ে গেছিল। ফার্স্ট বয়ের মুকুট খোয়ানোর গল্পে শোকাহত হয়েছিল পুরো পশ্চিম। ১১৫ বছরের অভ্যেস! ধাক্কা মানে জোর ধাক্কা লেগেছিল। মা লক্ষ্মীর কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, আমেরিকার মধ্যে কী দেখেছিলেন উনি? যোগ্যতা? মেধা?

পরিশ্রমের ক্ষমতা? ১১৫ বছর ধরে দেশটাকে ফার্স্ট করে রেখে দিলেন কীসের জন্য? যোগ্যতা, মেধা, পরিশ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ কি শুধু আমেরিকা আর ইউরোপেই আছে?

অন্য আরেকটা তথ্যে আসি, ১৯৮৭ সালে পৃথিবীতে মোট বিলিয়নেয়ার, অর্থাৎ ন্যূনতম ১০০ কোটির মালিক, ছিল ৪৭ জন। এদের মধ্যে কতজন আমেরিকার আন্দাজ করতে পারেন? সব্বাই! আবার ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী, সেসময় পৃথিবীর মোট ৪৫০ জন বিলিয়নেয়ারের মধ্যে ২৬৮ জন ছিল আমেরিকার। ১৯৬৮ সালের একটা তথ্য দিই, ভালো করে খেয়াল করুন, পৃথিবীতে মোট যা উৎপাদন হয়েছিল ওই সালে তার প্রায় ৪০% উৎপাদন করেছিল একা এই ফার্স্টবয়। তথ্যগুলো দেখলেই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে কেন গত শতাব্দীকে আমেরিকান সেঞ্চুরি বলা হয়। আমেরিকার সঙ্গে যদি আপনি ইউরোপের দেশগুলোকে জুড়ে নেন তাহলে তো গত শতাব্দীটা শুধু যেন ওদেরই ইতিহাস। মা লক্ষ্মী এমন সদয় হলেন আমেরিকা আর ইউরোপের প্রতি যে তার প্রভাব থেকে মা সরস্বতীও বাঁচতে পারলেন না। নোবেল পুরস্কারের কথা যদি দেখেন, ফার্স্টবয় পেয়েছে ৩৮৩টি নোবেল, ব্রিটিশরা পেল ১৩২টি, জার্মানি পেল ১০৮টি, ফ্রান্স ৬৯টি, সুইডেন ৩২টি, রাশিয়া ৩১, তারপরে সুইজারল্যান্ড ২৮, তারপর জাপান ২৮। এতক্ষণে এলো এশিয়ার নাম। আর তালিকা দীর্ঘ করব না। তাহলে আবার ইউরোপের নাম চলে আসে। মা লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে আমাদের কিন্তু সিরিয়াস অভিযোগ। নিজে তো গেলেনই, মা সরস্বতীকেও ষড়যন্ত্র করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন পশ্চিমে। কী এমন পাপ করলো দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলো যে দুই মা-ই রুষ্ট হলেন এদের উপর? শুধু মেধা আর যোগ্যতার জোরেই আমেরিকা ইউরোপের এই উত্থান এটা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস হয় না।

মা লক্ষ্মী যে কিছু একটা গন্ডগোল করছেন তার প্রমাণ পেলাম অন্য একটা তথ্যে। আমেরিকার দুই গোয়েন্দা সংস্থা CIA আর FBI এক বছরে যে পরিমাণ টাকা খরচ করে তা এই পৃথিবীর মোট ১৬৪টি দেশের সরকার নিজেদের দেশ চালানোর জন্যই খরচ করে উঠতে পারে না। ফার্স্ট বয়ের গোয়েন্দাগিরিতে এতো বিপুল টাকা খরচ করা মনে সন্দেহ জাগায়, ফার্স্টবয় জোর করে ফার্স্ট হওয়ার প্ল্যান করছে। জোর করে, ভয় দেখিয়ে, ষড়যন্ত্র করে সারা পৃথিবী জুড়ে জুটিয়েছে প্রচুর চ্যালা চামুন্ডা আর মোসাহেব, যারা ফার্স্ট বয়ের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলায়। হ্যাঁ মেলাতে মেলাতে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে মোসাহেবদের যে ফার্স্টবয় পেছনে একটা লাথি মারলেও মোসাহেবগিরি ছাড়তে পারে না। এই মোসাহেবগিরি এতটাই গভীর হয়ে পড়েছে, যে আমেরিকা মিলিয়নে (প্রতি দশ লক্ষে) কোভিড টেস্টিং-এর হিসেব দেয় বলে পৃথিবী জুড়ে সবাই মিলিয়নেই টেস্টিং-এর হিসেব দেওয়া শুরু করেছে। ফার্স্টবয় যদি বলে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, তো পৃথিবী জুড়ে রব ওঠে "ক্লোরোকুইন, ক্লোরোকুইন!" ফার্স্টবয় বলল "সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং", আর কেউ সাহস দেখালো না সেটাকে "ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং" বলার। বাকিদের নিজস্বতার কি এতই অভাব? প্রশ্নটা বারবার মনে ফিরে আসে।

তাহলে শুনুন, দাড়ি কাটার ব্লেড 7 o'clock, কোল্ড ড্রিংকস Thumbs Up, HP-এর ল্যাপটপ, অনলাইন বিপণি সংস্থা অ্যামাজন, সোস্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, ছোটবেলার টম এন্ড জেরি, বড় বেলার জেমস বন্ড, ক্যাডবেরি চকলেট, ডোমিনোজের পিৎজা, লেভিসের জিন্স্ থেকে শুরু

করে গাড়ির ইঞ্জিন, উড়োজাহাজ, ভেন্টিলেটর, কোনওটাই ভারতের নয়। বেশিরভাগই ইউরোপের বা আমেরিকার। এই আধিপত্য আমেরিকা, ইউরোপ শুধুমাত্র মেধার জোরে কায়েম করতে পেরেছে এমনটা আমাদের মনে হয় না। আর সেখানেই রাগ, তবে রাগ শুধু আমেরিকার উপর নয়, মোসাহেবদের উপরেও। চক্রান্ত আর গায়ের জোর ছাড়া এতক্ষণ যা যা তথ্য দিলাম তার ব্যাখ্যা আপনিও করতে পারবেন না। এই ফার্স্টবয় আর তার সঙ্গী ইউরোপীয় দেশগুলোর আক্রমনকে ধাক্কা দিয়েছিল রাশিয়া। ফার্স্টবয় আর তার বিশ্বজুড়ে মোসাহেবরা রাশিয়ার এই ধাক্কাকে নিন্দায় নিন্দায় ভরিয়ে দিয়েছে। রাশিয়া সহ দ্বিতীয় বিশ্বের মাথাচাড়া দেওয়া নিয়ে নানা তত্ত্ব ও তথ্য আছে। তার রাজনৈতিক দিকটা এখানে আলোচ্য নয়। অর্থনৈতিক সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বহু বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ফার্স্টবয়কে বহুক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। পশ্চিমী দুনিয়ার মার্কশিট আজ তা অস্বীকার করলেও ধাক্কাটা সেদিন তারা বেশ জোরালোভাবেই খেয়েছিল। নইলে পৃথিবীর ইতিহাসে 'কোল্ড ওয়ার' বস্তুটা এতো বহুচর্চিত হতো না।

'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' শব্দবন্ধের পেছনের রাজনীতি

'Social Distancing' শব্দটা Merriam Webster-এর ডিকশনারিতে জায়গা করে নিয়েছে মোটামুটি ২০০৩ সাল নাগাদ। বয়সে নবীন এই শব্দটা হয়ত এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি লিখিত ও উচ্চারিত শব্দ। সম্ভবত SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) জাতীয় সংক্রামক রোগ মোকাবিলার প্রেক্ষিতে এই শব্দের উৎপত্তি। WHO (World Health Organization) থেকে শুরু করে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ডাক্তার থেকে শুরু করে মিডিয়া, নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তা, সবাই সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং-কে করোনা মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরেছে। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা হল শারীরিক দূরত্ব। তাহলে 'ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং' শব্দবন্ধটি না নিয়ে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং ব্যবহার হয়ে চলেছে কেন? সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তৈরী হয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক জামিল জাইকি 'ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং' কথাটার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। অন্যদিকে অ্যান্ডরিচ, পেইজ মাস, পেইন ম্যাটেক্সের মত বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যে সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক একতা ও যোগাযোগ বেশি, তাঁরা যে কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে অনেক বেশি সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ এনারা বলছেন, উপকূলবর্তী অঞ্চলে যাদের বসবাস, যাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ বেশি, তাদের হারিকেন ঝড়ের প্রভাবে মৃত্যুর সংখ্যাও কম। শুধু এনারা নন, আরো বহু মানুষ এই প্রশ্ন তুলতে থাকেন। পরে আমরা দেখি, WHO-র সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ড. মেরিয়া ভান ২০শে মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

> We are changing to say physical distance and that's on purpose because people have to remain connected.

কিন্তু ততদিনে সরকার, মিডিয়া, প্রশাসন এবং সমাজের মাথায় অবস্থানকারী গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের হাত ধরে 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' শব্দবন্ধটিই পৃথিবী জুড়ে জায়গা নিয়ে ফেলেছে। 'ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং' ঢের বেশি যথার্থ হলেও কেন 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' কথাটাই প্রচলিত হয়ে উঠল সমাজে,

এমনকি বিতর্ক ওঠার পরেও বদলাল না, এটা আমাদের মত কাউকে কাউকে হয়ত ভাবায়। কেউ বলতে পারেন, শব্দ প্রয়োগকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন। বহুক্ষেত্রে ছোট্ট এক শব্দের ফারাকই বাস্তবে বড় এক ফারাককে চিহ্নিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন 'ভালোলাগা' আর 'ভালোবাসা'র মধ্যে বিশাল বড় ফারাক দেখেন, সমাজ জীবনে তেমনই 'অনুপ্রবেশকারী' আর 'শরণার্থী' বিশাল ফারাক তৈরী করে দেয়। শব্দের ফারাক আর নিছক শব্দের ফারাক হয়ে থাকে না, অনেক সময় তা নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকেরও উদাহরণ হয়ে পড়ে। এখানেও ঠিক সেই প্রশ্নটাই উঠতে পারে। সমাজের উপরমহল 'ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং' কথাটা না নিয়ে কেন 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' কথাটা ব্যবহার করল? আজকের করোনা বা আগামীকালের কোনও সংক্রামক ব্যাধিকে রোখবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দুই কথা কি দুই পৃথক পরিকল্পনাকে দেখায়? ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের ধারণা অন্তত তাই-ই। এই মুহূর্তে চারপাশটাকে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, করোনা নিয়ে কেউ বেপরোয়া, আবার কেউ বাড়তি আতঙ্কিত। বেপরোয়া আর আতঙ্কিতদের আচরণ পৃথক হলেও মূল জায়গাটা একই, তা হল যুক্তি-বিজ্ঞানকে বোঝার ব্যাপারে বিপুল অনাগ্রহ। করোনা রুখতে মূলত দরকার ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক গণসচেতনতা। আর এদিকে সমাজের উপরমহল তৈরি করে ফেলল গণ-আতঙ্ক, মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে বেপরোয়াপনা। এর ফল— কোথাও প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতাল ফিরিয়ে দিচ্ছে, কোথাও বাড়িওয়ালারা ভাড়াটিয়াদের নির্মমভাবে রাস্তায় বের করে দিচ্ছে, কোথাও ডাক্তারদের সম্মান জানানোর নামে থালা নিয়ে মিছিল হচ্ছে, কোথাও মানুষ অসুস্থ হলে পাশে কেউ এগোতে চাইছে না। এমন অজস্র অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিদিন। ছবিটা কি অন্যরকম হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না? ডাক্তার কমিউনিটি ও সরকারের সহযোগিতায় উৎসাহী যুবক-যুবতীদের ট্রেনিং মারফত সংক্রমণের ব্যাখ্যা ও সতর্কতার জায়গাটা বুঝিয়ে প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস কি নেওয়া যেত না? সচেতনতার একটি শক্ত ভিত যদি সমাজে গড়ে তোলা যেত তাহলে তো খুলে যেতে পারত স্থানীয় স্তরে, গণস্তরে উদ্যোগের দরজাটা। তখন আমরা দেখতে পেতাম ঘরে ঘরে কীভাবে মাস্ক তৈরি ও প্রতিবেশীকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষে একরাতের মধ্যে প্রতি হাতে মাস্ক পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পেতাম, রাস্তায় গরু, বিড়াল, কুকুর, পশুপাখিদের অভুক্ত থাকতে হচ্ছে না। পাড়ায় পাড়ায় আপন নিয়মেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পেতাম, একটা পাড়া বা একটা গ্রামই ঠিক করে নিতে পারছে সেই পাড়ায় বা সেই গ্রামে থাকা কতজন মানুষ রেশনের সংকটে ভুগছেন। সে সমস্যা মিটেও যেত স্থানীয়ভাবে, অথবা প্রশাসনের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিয়ে। একটা পাড়া বা একটা গ্রামই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বলে দিতে পারত, ওই অঞ্চলের কতজন মানুষ ভিন রাজ্যে আটকে পড়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কতজনের এক্ষুনি সাহায্যের প্রয়োজন। হয়ত, দেখতে পেতাম, স্কুল-টিউশন বন্ধ বলে পড়তে না পারা পাশের বাড়ির ছেলেটিকে পড়িয়ে দিচ্ছেন তার প্রতিবেশী। এক ছাদে ছাত্রছাত্রী, তো পাশের ছাদে শিক্ষিকা বা শিক্ষক। দেখতে পেতাম, করোনার সিম্পটম দেখে লুকোনোর বদলে কেউ ডাক্তার দেখাচ্ছে ও কড়া শৃঙ্খলার মধ্যে রাখছে নিজেকে। দেখতে পেতাম, মানুষ ভাবছেন করোনার সমাধান। হয়ত দেখতে পেতাম যেভাবে ফ্রান্সের ম্যাকডোনাল্ডস্-এর শ্রমিকেরা একটি রেস্টুরেন্টকে দখল করে খাবার দাবার ভুখা জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছেন, সেরকম ঘটনাও।

তালিকা আর বাড়াবো না। আপনি যদি কল্পনা করেন, তাহলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন লাখ লাখ মানুষের গণউদ্যোগ আরো কত কী করতে পারে। চোখের পলকে, অনায়াসে। ইতিহাস তেমনই ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু এসব হবে কী করে! সচেতনতা-সতর্কতা ছাড়া উদ্যোগ মানেই তো সংক্রমণের সম্ভাবনা। একারণেই বৈজ্ঞানিক সচেতনতার প্রয়োজন ছিল। এইসব গণউদ্যোগের মূল ভিত্তি গণসচেতনতা ব্যাপারটাই তৈরি করতে নারাজ সমাজের উপরমহল। কারণ, তাঁরা ভয় পান গণসচেতনতা ও গণউদ্যোগকে। এসবের মধ্যে তাঁরা অশনি সংকেত দেখেন, পরস্পরের সহযোগিতায় উদ্যোগী সমাজ নিজেকে পরিচালনা করতে করতে যদি উপর মহলকে প্রশ্ন করে বসে? সরকারের নীতিকেই যদি চ্যালেঞ্জ করে বসে? তাই এই উপরমহলের চাই আতঙ্কিত একটা সমাজ, তাঁদেরই উপর নির্ভরশীল একটা সমাজ। তবেই তো অল্প পরিশ্রমে পরিচালনা করা যাবে কোটি কোটি মানুষকে। রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার এ এক মহৎ সুযোগ। করোনা সেই সুযোগকেই আরো সুগম করে দিচ্ছে। তাঁরা হয়ত চান আজ বাদে কাল লকডাউন উঠে গেলেও ডিসট্যান্সিং যেন সোশ্যালাইজ্‌ড্‌ হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, একজন ভগবান থাকেন আর তাঁর কোটি কোটি ভক্ত, মাঝখানে আর কিছু নেই। এঁনারা তেমনই চান— একটা রাষ্ট্র থাক আর থাক পরিচালিত হতে উন্মুখ, একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি মানুষ, যারা বিজ্ঞানে নয়, থালা বাজানোয় ভরসা রাখবে। একা একা আতঙ্কে দিন কাটাবে, একে অপরের দিকে আড়চোখে তাকাবে আর অপেক্ষা করবে কোনো দৈববাণীর। আপনি করোনা থেকে বাঁচতে চান, কেউ হয়ত করোনা দিয়েই মারবার এক পরিকল্পনা ফাঁদছে। তাই আপনি ফেসবুকে যতই তর্ক তুলুন "সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং কথাটা বাদ দেওয়া হোক কারণ সোশ্যাল সলিডারিটি প্রয়োজন", আপনার-আমার মাথায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরা এই সলিডারিটিতেই দেখেন অশনি সংকেত। তাঁদের চাই 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং' কথাটাই।

কখনও কখনও সরকারও যে গণউদ্যোগ চায় না তেমনটা নয়। যখন যখন মানুষকে তার অধিকার, প্রাপ্য দিয়ে উঠতে পারে না, তখন তখন পরিস্থিতি সামলাতে গণউদ্যোগের আবেদন করে। "নাগরিকেরও তো কিছু কর্তব্য আছে"— এইসব বলে জ্ঞান দেয় । এক কথায়, প্রকৃত গণউদ্যোগ নয়, প্রয়োজনে তাদের মাপ অনুযায়ী উদ্যোগী হওয়ার নিদান দেয় জনগণকে। এসবের মাঝে চাপা পড়ে থাকে প্রকৃতি ধ্বংসের কাহিনী, চাপা পড়ে থাকে গরীব মানুষের খিদে, চাপা পড়ে থাকে ছাঁটাইয়ের গল্প, চাপা পড়ে থাকে আস্ত সমাজটাই।

অর্থনীতির যেসমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিল এই লকডাউন

প্রথম প্রশ্ন, কবে আবার সবকিছু আগের মত স্বাভাবিক হবে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কী হাল হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর কেউই সঠিকভাবে জানে না। ভ্যাকসিন না বেরনো অবধি সংক্রমণমুক্ত পৃথিবীর কথা কল্পনা করাই বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ততদিন কি তবে লকডাউন চলবে? নিশ্চয়ই নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা দেশ নানা বন্দোবস্ত নেবে। পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে সরকার কোনও তাড়াহুড়ো করে ফেলবে কিনা, ঝুঁকি নিয়ে ফেলবে কিনা, সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তাড়াহুড়ো বা ঝুঁকি নিয়ে ফেলার প্রশ্ন উঠছে কারণ বড় বড় ব্যবসাদারদের থেকে চাপ আছে সরকারের

উপর লকডাউন তোলার জন্য। আর সরকারও লকডাউন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় রেশন, ওষুধ, আর্থিক সাহায্য করতে যথেষ্ট অনুৎসাহ দেখাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের চাপে হোক বা সরকারি খরচ কমানোর তাগিদে, লকডাউন তোলার প্রশ্নে তাড়াহুড়ো করলে সাধারণ মানুষেরই জীবন একটা ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। তাছাড়া লকডাউন তুলতে গেলেও, উৎপাদনক্ষেত্র বা অফিস সর্বত্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে, যেমন স্যানিটাইজার, ডিসইনফেক্ট্যান্ট, ইত্যাদি থাকার বন্দোবস্ত করেই তারপর সরকারের লকডাউন তোলা উচিত।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কাজকর্ম আর ব্যবসা-বাণিজ্য। এই প্রশ্ন ছোট-বড় কোম্পানিতে কাজ করা সকলের। এমনকি কনট্র্যাক্টে যারা কাজ করেন, তাঁদেরও। শিবপুর, NIT, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্লেসমেন্টে পাওয়া চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মাথায় হাত পড়েছে সাধারণ চাকুরিজীবি মধ্যবিত্তের। বড় বড় ব্যবসায়ীদের দাবি, আর্থিক সঙ্কটের কারণে তারা এইমুহূর্তে কর্মচারীদের বেতন দিতে অক্ষম। এই যুক্তি দেখিয়ে চলছে গণহারে ছাঁটাই। আসলে কী জানেন, উৎপাদন চললে যেমন আমার আপনার পেটে ভাত জোটে তেমন এদেরও কপালে জোটে বিপুল অঙ্কের লাভ। সেই হিসেবটা আরেকবার মনে করিয়ে দিই। অক্সফ্যাম নামের একটি বেসরকারি সামাজিক সংস্থার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জাতীয় আয় যদি ১০০ টাকা হয়, তার মধ্যে ৭৭ টাকা যায় ১% মানুষের হাতে। উল্টো করে বললে, এই একমাসে যদি আপনি ১০-১২ হাজার টাকা আয় না করে থাকতে পারেন, তেমনি ওই বড়লোকদের আয় আটকে গেছে প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ভুললে চলবে না, দোকানে শোরুম আর গোডাউন থাকে। শোরুমে যা মাল দেখেন, গোডাউনে তার থেকে অনেক অনেক বেশি মাল থাকে। তেমনি এই ব্যবসাদাররা "সঙ্কট, সঙ্কট" বলে যেটা তুলে ধরতে চাইছে সেটা আসলে শোরুমের ছবিটা। এদের গোডাউনে জমে আছে সম্পদের পাহাড়। তাই আজ "সঙ্কট, সঙ্কট" বলে কান্না জুড়লেও তাতে আমার-আপনার কান দেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে সরকার এদের নির্দেশ দিক, কাউকে ছাঁটাই করা যাবে না, বেতন কমানো যাবে না কারও। না ছাঁটাই করে, বেতন না কমিয়ে উৎপাদন চালালে কী আর এমন অসুবিধা হবে ওদের! বড়জোর লাভের গুড় আগের হারে গোডাউনে জমা করতে পারবে না। খুব বেশি হলে, গোডাউন থেকেই না হয় খানিক খরচা হবে। তাতেও খুব যে গোডাউন ফাঁকা হবে তা নয়। ২০১৩ সালে অক্সফ্যামের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর ধনীতম ১০০টি পরিবার, খেয়াল করবেন, মাত্র ১০০টি পরিবারের হাতে যা সম্পদ আছে তা দিয়ে একবার নয়, চার চারবার পৃথিবীর সমস্ত দারিদ্র্য মুছে ফেলা সম্ভব। সমুদ্র থেকে খানিক জল তুলে নিলে জল কি তাতে কমে? কমে না। তেমনি এদের গোডাউন থেকে এই সঙ্কটের সময়ে যদি এরা কিছুটা বার করে তাতেও এদের ভাঁড়ার এমন কিছুই ফাঁকা হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার ছাঁটাই ও বেতন কমানো বিরোধী বিল ইত্যাদি এনে এদের বাধ্য করবে কি না। যদি করে, তবেই বেরোবে কাঙ্খিত সমাধান সূত্র।

কেউ বলতে পারেন, "সরকার চাইলেই কি কোম্পানিগুলিকে এই নির্দেশ দিতে পারে নাকি!" আরে দেখলেন না, অর্ণব গোস্বামী কাল রাতে সুপ্রীম কোর্টে অ্যাপিল করল আর ১২ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই কেসটা শুনানির জন্য লিস্টে উঠে গেল! সরকার না চাইলে কি হাজার হাজার কেস পড়ে থাকতে ওই কেসটা এত তাড়াতাড়ি উঠতে পারে? কোটা বা হরিদ্বার থেকে বাসে করে ফেরানোর কথাই দেখুন না। সরকার চাইলে সবই পারে।

আর ওরাও রাজি হতে বাধ্য, কারণ আমাদের যেমন চাকরি চাই, ওদেরও তো ব্যবসা করে গোডাউন ভরাতে হবে! তাই সরকার ছাঁটাই-বিরোধী বিল যদি আনে, তাহলে এরা প্রথমে একটু কান্নাকাটি করলেও ব্যবসার মুখ চেয়ে ঠিকই মেনে নিতে বাধ্য হবে। এখন কেউ বলতে পারেন, "এর ফলে ব্যবসায়ীরা তো উৎপাদন বন্ধও রাখতে পারে। ওদের আর কী? ওদের তো আমাদের মত ভাত-কাপড়ের চিন্তা নেই। ওরা ব্যবসা বন্ধও রেখে দিতে পারে।" ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, আমার-আপনারই বা এত চিন্তা কেন? ধরে নিন না, লকডাউন না, একটা ধর্মঘট চলছে, বিশ্বজুড়ে একটা ধর্মঘট। ওরা যতক্ষণ না ছাঁটাই বা বেতন কমানো, এইসব বন্ধ করছে, আমরাও কাজে যাচ্ছি না। এভাবেই তো একমাস কাটালাম, না হয় আরও একমাস কাটাব। যদি তাতেও সমস্যা না কাটে, সরকার নির্দেশ দিক, উৎপাদন বন্ধ রাখা যাবে না। উৎপাদন চালাতে না পারলে তারা বলে দিক, উৎপাদন জনগণ চালিয়ে নেবে! ওদের কিছুই করতে লাগবে না। সরকারি সহযোগিতায় আপনাদের কারখানার কাজ কি আপনারাই চালাতে পারবেন না? সত্যি একবার ভেবে দেখুন তো! ছোট ছোট স্বনির্ভর গোষ্ঠী যদি নানা ধরনের উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে নিজেদের পরিকল্পনায়, বড় বড় স্বনির্ভর গোষ্ঠী তবে কেন পারবে না? কেউ আবার অন্য একটা প্রশ্ন তুলতে পারেন, কারোর ব্যবসা সে কীভাবে করবে, কখন করবে, তার উপর এত সরকারি নির্দেশ কি চাপানো উচিত? তার সম্পদের উপর তো তারই অধিকার আছে। ধুর্ মশাই, ব্যবসা কাকে বলে শুনুন তবে। এত অধিকারের কোনও ব্যাপার নেই।

ধরুন, একটা কোচিং ইনস্টিটিউটে ভর্তি হল একদল ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক হিসেবে আপনি সেখানে কর্মরত, পড়াবেন ছেলেমেয়েদের। তারা টিউশন পড়বে, আপনি পড়াবেন, আর মাঝখান থেকে মালিকপক্ষ মেরে দিয়ে যাবে টাকা। হিসেব করে দেখবেন, ছাত্রছাত্রীদের সরাসরিভাবে পড়ালে মাসে কত পেতে পারতেন, আর আপাতত বেতন হিসেবে কত পাচ্ছেন। খুঁজে পাবেন তারতম্য। লভ্যাংশ কাদের পকেটে গেল তাহলে? খেলাটা খুব সহজ। মালিকপক্ষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অভিভাবকদের বুঝিয়ে দেবে, তাদের হাতে অনেক ভালো ভালো শিক্ষক আছে। হাতে একজন স্টুডেন্ট না থাকলেও শিক্ষকদের গিয়ে বুঝিয়ে দেবে ওদের হাতে অনেক বড়লোক ছাত্রছাত্রী আছে। ব্যস! বাকিটা আলাদিন করে দিয়ে যাবে। আপনি পড়াবেন, ছেলেমেয়েরা পড়বে, আর মাঝে নেপোয় মারবে দই। আপনি তুলো চাষ করবেন, আপনিই সুতো বুনে কাপড় তৈরি করবেন আর সেই কাপড় লোকে পরবে। এক্ষেত্রেও দেখবেন মাঝে আছে সেই নেপো। বড় ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ খাটে। ধরুন, আপনি গাড়ির কারখানা খুলবেন বলে SBI-তে গিয়ে লোন চাইলেন। সরকারের টাকা, মানে জনগণের টাকা লোন হিসেবে নিয়ে ব্যবসায় লাগাবেন। আপনার এই পরিকল্পনার কথা শুনে সরকার তো গদগদ হয়ে পড়বে। তারাই আবার আপনাকে বিনিয়োগের জন্য অসংখ্য রসগোল্লা খাইয়ে জমি, বিদ্যুৎ এসব সস্তায় দেবে। ব্যবসায় যদি লাভ হয় আপনার তাহলে তো লাভের গুড় আপনি গোডাউনে নিয়ে গেলেন আর যদি লস্ হয়, তাহলে সরকারকে বলবেন, মানে জনগণকে বলবেন। তাহলে সরকার আবার অর্থনৈতিক সঙ্কটের অজুহাত দিয়ে আপনার ঋণ মকুব করবে, বা বেলআউট প্যাকেজ ঘোষণা করবে। পরেরদিন আবার আপনি ব্যাঙ্কে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে পৌঁছে যাবেন। এই হল সওদা, বুঝলেন! তাই ওদের সম্পত্তির উপর ওদের অধিকার আছে এমনটা ভাবার কোন কারণ

নেই। নেপোকে নিয়ে এত ইমোশনাল হবেন না, বরং সরকারকে নিয়ে একটু ভাবুন।

এবারে একটা গল্প বলি। ধরুন আপনি আপনার বন্ধুকে টাকা ধার দিয়েছেন। আর আপনার বিপদে উনি সেই ধার নেওয়া টাকার পুরোটা ফেরৎ না দিয়ে কিছুটা ফেরৎ দিলেন। আর সর্বত্র বলে বেড়ালেন, বিপদের সময়ে উনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে কত মহান কাজ করেছেন। কেমন লাগবে আপনার? নিশ্চয়ই বিরক্ত লাগবে খুব? আর যদি শোনেন, ওই বন্ধু আপনাকে ওই টাকা দান করেছেন বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তাহলে কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই আপনার মারতে ইচ্ছা করবে ওই বন্ধুকে? ঠিক। এবার আসুন কতগুলো তথ্য দেখে নিই, যা এই গল্পটার সাথে মেলে।

'বিজনেস টুডে' পত্রিকায় বেরনো কিছু তথ্য আর কিছু RTI-এর জবাবে সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ১০ বছরে ১২ জন শিল্পপতিকে সরকার ঋণ মুকুব করেছে ৭.৭ লক্ষ কোটি টাকা। তথ্যটাকে কিছুটা ভেঙে বুঝিয়ে দিই। জনগণের টাকা, মানে আমার-আপনার ডাইরেক্ট-ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের টাকা থেকে গত ১০ বছরে ১২ জন শিল্পপতিকে ৭.৭ লক্ষ কোটি টাকা ধার দেওয়া হল। আমাদের অনুমতি কবে যে নিল সরকার, কে জানে! বিনা অনুমতিতেই আমাদের টাকা সরকার বাহাদুর ধার দিয়ে দিল। ভালো কথা। সরকার বাহাদুর আবার আমাদের হয়ে ওই ১২ জন শিল্পপতির সেই ঋণ মকুব, মানে দানই করে দিল। বুঝতে পারছেন? আমি আপনি খেতে না পেলেও বিন্দু বিন্দু করে ট্যাক্স মারফত সরকারের হাতে যে টাকা তুলে দিই, সেই টাকা সরকার নিজের মর্জিতে দান করে দিল। আর করল তো করল, সবথেকে বড়লোক ১২ জন শিল্পপতিকে করল। মানে, আপনি দান করলেন টাটা-আম্বানি-আদানিদের। কী অবিশ্বাস্য না ব্যাপারটা? ভাবতেই পারছেন না নিশ্চয়ই? তথ্য দিয়ে বলছি, তারপরও বোধহয় বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনি দান করছেন আর টাটা সেই টাকা হাত পেতে নিচ্ছে! বিশ্বাস করতে হয় করুন, না করতে হয় না করুন। কিন্তু কথাটা সত্যি। সেই আমি-আপনি, মানে ভারতের কোটি কোটি মানুষ যখন করোনা সঙ্কটে কাজ হারানোর ভয়ে মরছি বা খেতে না পেয়ে ভুগছি, তখন ওই বড়লোক ১২ জন কেউ ৫ কোটি, কেউ ১০০ কোটি টাকা দান করার কথা ঘোষণা করছেন নাকি জনস্বার্থে। তাহলে হিসেবটা কোথায় এসে দাঁড়াল? সহজে বুঝে নেওয়ার জন্য আমরা আপাতত কোটির শূন্যগুলিকে সরিয়ে রাখছি। তাহলে ১০ বছরে আমরা যাদের ৭.৭ লক্ষ টাকা ধার দিলাম, বিপদের সময়ে তারা অন্তত ৭.৭ লক্ষ টাকা ফেরত দিক। সে তো দূরের কথা, সব মিলিয়ে হাজার দেড়েক টাকা ফেরত দিচ্ছে। তাও ঢাকঢোল পিটিয়ে দান করছে বলে ঘোষণা করছে। ভাবতে পারছেন? কেউ যদি ৭.৭ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে হাজার দেড়েক টাকা ফেরৎ দেয়, আর তাও দান করছে বলে ঢাকঢোল পেটায়, তাহলে কেমন লাগবে? তাই সমস্ত শিক্ষিত বন্ধুদের বলব, টাটা-আম্বানি-আদানিদের এই দান করার ঘোষণাটিকে চিনতে শিখুন। সাথে মাথায় রাখুন, এরই মধ্যে খেতে না পেয়ে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ভারতবর্ষে ২৩ জন মানুষ মারা গেছেন। ওই ২৩ জন মানুষের মৃত্যু নিয়ে শুধু শোক না করে মহান দাতাকর্ণদের ধাপ্পাবাজির খবর সবাইকে জানিয়ে দিন, ছড়িয়ে দিন।

মেয়েদের অবহেলা একটি বৈশ্বিক বিষয় হয়ে পড়েছে

করোনা ধনী-দরিদ্র না চিনলেও নারী-পুরুষ চেনে। হ্যাঁ, এখনও অবধি

WHO-এর তথ্য অনুযায়ী চিনে করোনা আক্রান্ত পুরুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৪.৭% আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ২.৮%। বলতে পারেন, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মৃত্যুর হার প্রায় অর্ধেক। নাজেহাল হওয়া ইতালিতেও একই ছবি। ইতালিতে করোনার প্রকোপে মৃত প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭১ জনই পুরুষ। পৃথিবী জুড়ে ছবিটা একইরকম। মহিলাদের মৃত্যুর হার পুরুষদের তুলনায় বেশ কম। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে মেয়েদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কি ছেলেদের তুলনায় বেশি? আপাতত তথ্য তাই বলছে। এ নিয়ে, "নেচার"-এর মত বিখ্যাত পত্রিকায় কিছুদিন আগে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। লেখিকা সাব্রা ক্লীন জনস John Hopkins University-র অধ্যাপিকা। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের ইমিউনিটি সিস্টেম দ্রুত সাড়া দেয়। যেমন, হেপাটাইটিস-বি, ডিপথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্মল পক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে। করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে এই মুহূর্তে নানা জায়গায় গবেষণা চলছে। সেই প্রসঙ্গে চর্চা করতে গিয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি অবহেলার কিছু প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তা নিয়ে সামান্য আলাপ করা যাক।

ধরুন আপনি আপনার বাচ্চাকে কোনও ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। তখন আর নিশ্চয়ই আপনি আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন না ওই ওষুধের কোনও সাইড এফেক্ট আছে কি না। ডাক্তার যখন দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তেই দিয়েছেন, তাই নিশ্চিন্তে থাকেন। ঠিকই। কিন্তু আজ এমন একটা তথ্য বলব যা আপনাদের সবাইকে অবাক করে দেবে। বেশ কিছু ওষুধের পুরুষের শরীরে কোনও সাইড এফেক্ট না থাকলেও মহিলাদের শরীরে ভয়ঙ্কর সাইড এফেক্ট রয়েছে। এর কারণ, যখন কোনও ভ্যাকসিন বা ওষুধ নিয়ে গবেষণা হয়, তখন তা হয় কেবলমাত্র পুরুষদের শরীরেই। মহিলাদের শরীরে ওই ওষুধ বা ভ্যাকসিনের প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা খুবই কম। বেশিরভাগ ওষুধের ক্ষেত্রেই মহিলাদের শরীরে প্রভাব কী তা জানার আগেই ওষুধটাকে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিখ্যাত "নেচার" পত্রিকায় প্রকাশিত একটা আর্টিকেল বলছে, পৃথিবীতে সমস্ত হার্টের রোগ সংক্রান্ত ওষুধের পরীক্ষায় তিনটের মধ্যে মাত্র একটা বাজারে আসার আগে মহিলাদের শরীরে পরীক্ষিত হয়। আপনাদের চেনা একটা ওষুধের নাম বলি। অ্যাসপিরিন। এটা সাধারণত হার্টের রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই অ্যাসপিরিন মেয়েদের স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমায় ঠিকই, কিন্তু হার্টের রোগের সম্ভাবনা মোটেই কমায় না। এমনকি, ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে বাজারে যে ১০টি নতুন ওষুধ তুলে নেওয়া হয় তার মধ্যে ৮টিই তুলে নেওয়া হয়েছিল মহিলাদের শরীরে ভয়ঙ্কর সাইড এফেক্টের জন্য। US accounting office-এর একটা সার্ভে বলছে, এই ওষুধগুলো তুলে নেওয়ার কারণ মহিলাদের শরীরে এই ওষুধগুলোর ফলে হার্টের রোগের সম্ভাবনা বাড়ে, যা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। তাহলে কি পুরুষ ও মহিলাদের শরীর সাদা চোখে যতটা আলাদা মনে হয় তার থেকেও অনেক বেশি আলাদা? বায়োলজির গবেষণার ক্ষেত্রে বা ওষুধ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তাহলে কি মহিলাদের এবং পুরুষদের শরীর নিয়ে আলাদা আলাদা করে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে?

পরিযায়ী আর ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন শ্রমিকদের দুর্দশার পিছনে দায় কার?

সুরাট, বান্দ্রার ঘটনাগুলোর পর অনেকে প্রশ্ন করছেন কীভাবে এত এত

পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরানো যাবে? সেটা কি আদৌ সম্ভব? আমাদের মতে, হ্যাঁ সম্ভব। প্রথমে দেখতে পারাটা সম্ভব হতে হবে। যেভাবে চিন, ইরান, আমেরিকা থেকে এরোপ্লেনে করে প্রবাসী ভারতীয়দের আনতে পারা গেছিল, সেভাবে। যেভাবে হরিদ্বার থেকে ১৮০০ তীর্থযাত্রীকে ২৮টি বাসে করে ফিরিয়ে আনা হল, সেভাবে। বান্দ্রা, সুরাটের মত ভারতবর্ষ জুড়ে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে বাড়ি ফিরে আসার ব্যবস্থাও করা সম্ভব। বান্দ্রা, সুরাট, ব্যাঙ্গালোর সহ ভারতের যেখানে যেখানে শ্রমিকরা আটকে পড়েছেন এবং প্রিয়জনদের কাছে ফিরতে চাইছেন, তাঁদের জন্য ট্রেন, বাস, প্লেনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তা করতে গিয়ে বস্তাবন্দী করে ডাস্টবিনে ফেলার দরকার নেই। প্রয়োজনে ট্রেনের একেকটা কুপে সর্বাধিক তিন কি চারজন বসবেন, প্লেনে একেকটা করে রো বাদ দিয়ে বসবেন, বাসেও তাই। থাকবে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা, কোভিড টেস্টিং ও গন্তব্যস্থলে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা। আরও নানা উপায় ভেবে বার করা সম্ভব। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে যৌথভাবে আগামী কয়েকদিনে সেই বিশেষ ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে। কিন্তু এখানেই বাঁধছে মূল গন্ডগোল। শ্রেণীবৈষম্য সমাজের মূলে, তাই যুক্তিতে ঠিক লাগলেও কিছুতেই যেন গরীব, অশিক্ষিত শ্রমিকরা বিনে পয়সায় প্লেন, ট্রেন, লাক্সারি বাসে ফিরছেন, এটা ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। অশিক্ষিত শ্রমিকদের জন্য এমন কিছু ভাবতে পারার মানসিক বাধাকে আগে পেরোতে হবে। এটা তাঁদের প্রত্যেকের অধিকার। ফিরতে চাওয়া মানুষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরিয়ে কোয়ারেন্টিনে রাখার বদলে ঘরে ফিরতে না দিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে রাখাটা শুধু সরকারি অপদার্থতা নয়, মানবাধিকার-লঙ্ঘনকারী এক নৃশংস অমানবিকতা। কেবল সরকার কেন, আমি-আপনিও বোধহয় বেশ খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এভাবে ভাবতে। তাই এতকিছু দেখেও আমাদের গায়ে বিবেকের আঁচড়টি লাগছে না।

অনেকে আবার বলছেন, বাড়ি না ফিরিয়ে যে যেখানে আছে সেখানেই রেশন, খাবারের বন্দোবস্ত করলেই তো সমস্যা মিটে যায়। আবার ওই একই দেখার সমস্যা। মানুষ বাড়ি ফেরে বাড়ি ফেরার জন্য, খাবারের জন্য নয়। আমাকে, আপনাকে যদি খাবার দিয়ে দূরে আটকে রাখা হত, তাহলে আমরা কি বাড়িই ফিরতে চাইতাম না?

নদীতে অনেক জল বয়ে গেলেও কিছু প্রশ্ন পিছু ছাড়ছে না। প্রথমেই হাতে চার-পাঁচদিন সময় রেখে লকডাউন ঘোষণা করলে এত সমস্যাই হত না। পাল্টা উত্তর দিচ্ছে অনেকে, "সময় দেওয়ার মত সময় ছিল না।" এই কথাটা নিয়েই তর্ক। জনতা কার্ফুর আগে বেশ কিছুদিন ধরে বিদেশে থাকা ভারতীয়দের ফেরানোর বন্দোবস্ত করেছিল সরকার। তাহলে, এই শ্রমিকদের জন্য করা হল না কেন? ১৯শে মার্চই স্পেশাল ট্রেন, বাস চালিয়ে এদেরকে ফেরানোর সহজ সমাধানটাই বা নেওয়া হল না কেন? ২৩শে মার্চই বোঝা গেল লকডাউন দরকার আর দরকার মানে ২৪ থেকেই দরকার? মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে? এমনটা আবার হয় নাকি? ২৩ তারিখ যদি পরিস্থিতি এতটাই জটিল ছিল তাহলে তো ৭-১০ দিন আগে থেকেই তা বুঝতে পারার কথা। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার তার আগে ট্রাম্প, মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতা দখল, দিল্লী কান্ডে ব্যস্ত ছিল বলেই কি পরিস্থিতি অনুমানে এত দেরী? নাকি দেরীটা পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার-আপনার আন্দাজে থাকলেও সরকারের কাছে নেই।

লাখ লাখ গরীব মানুষের জীবনকে মূল্যহীন ভাবার একটা অমানবিক অভ্যস্ততার কথা এতক্ষণ বলছিলাম। তবে, এর একটা উল্টো কাহিনি ছোট্ট করে বলি। ২০১৫ এর ঘটনা। সেন্ট জর্জ, কানাডার একটা শহর। সেই শহরেরই বাসিন্দা ইভান লেভারসাস নামে এক ৭ বছরের শিশু। ক্যান্সার রোগে সে আক্রান্ত। চিকিৎসা চললেও শরীরের অবস্থা ভালো ছিল না। ডাক্তাররা বলেই দিয়েছিলেন, ইভান জীবনের শেষ কটা দিন গুণছে। ইভানের শরীরের যা অবস্থা ছিল, তাতে সে ঘরের বাইরে বেরোতে পারত না। মা-বাবা তাকে এই বলে সান্তনা দিতেন, যে বড়দিনের উৎসবে তাকে বাইরে নিয়ে যাবেন। ইভানও সারাক্ষণ বড়দিনের অপেক্ষায় থাকত। ইভানের মা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর ছেলের বড়দিন দেখা হয়তো না-ও হতে পারে। শরীর খুব দ্রুত খারাপ হচ্ছিল তার। একদিন মা ঠিক করলেন, বড়দিন আসার আগেই বড়দিনের আয়োজন করবেন ছেলের জন্য। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়, ইভানের মা এটা ভেবেছিলেন কীভাবে! বড়দিন মানে তো পুরো একটা শহর, তার প্রত্যেকটা বাড়ি, মানুষ, স্কুল, কলেজ, গীর্জা, রাস্তাঘাট, পার্ক, সান্তাক্লজ, সব মিলিয়ে একটা অন্যরকম ব্যাপার। এসব বড়দিনের আগে করতে গেলে তো শহরের সমস্ত মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে! যদি তাও কোনোক্রমে সম্ভব হয়, আবহাওয়া? বড়দিনের হিমশীতল আবহাওয়া আর বরফঢাকা পরিবেশ অক্টোবর মাসে চাইলেও কি পাওয়া সম্ভব? ধরুন আপনাকে বলা হল, দুর্গাপুজোর তিনমাস আগে পুরো দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে হবে। সেরকমই প্রায় ব্যাপরটা। সবাইকে জানাই, হ্যাঁ, সম্ভব হয়েছিল! পুরো শহর ইভানের জন্য ২৪শে অক্টোবর বড়দিন পালন করেছিল। শহরবাসীর অনুরোধে প্রশাসনও সাহায্য করেছিল। সকলের উদ্যোগে সিনেমায় ব্যবহার করা যন্ত্র দিয়ে তুষারপাতও করানো হয়েছিল। ইভান মারা যায় ৬ই ডিসেম্বর। একটা শিশুর একটা ইচ্ছা পূরণের জন্য শহরবাসীর এই দলবদ্ধ প্রচেষ্টাও কিন্তু মানুষেরই ইতিহাসের অংশ।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সম্ভাব্য ছাঁটাইয়ের বিষয়টা রেখেছেন। সেখান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা বেশ প্রবল হয়ে উঠছে। এবং আমরা খবরও পাচ্ছি, নানা জায়গায় ছাঁটাইয়ের। কিন্তু উনি কী করলেন? উনি অনুরোধ করলেন মালিকদের, যাতে মালিকরা ছাঁটাই না করে। এটা একটা কথা হল? মালিকরা কি অনুরোধ শোনার পাত্র? এখানে সরকারের কি কিছুই করার ছিল না, অনুরোধ করা বাদে? আমাদের তো ধারণা অনেক কিছু করার ছিল। সরকার অন্তত ছাঁটাই যাতে না হয় তাই নিয়ে একটা আইন লাগু করতে পারত। সেটাও তারা করল না। যা চলছিল সেভাবেই চলতে দিল। খাদ্যের প্রশ্নে উনি কী বললেন? উনি বললেন খাবার দিয়ে প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে। তাহলে সরকার কি রেশন পৌঁছে দিতে ব্যর্থ? তাই জনগণের সাহায্য চাইছে? সে ভালো কথা, ধরা যাক তাতেও অসুবিধে নেই। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনগণও তো প্রচুর ব্যাপারে সাহায্য চাইছে আপনার কাছে। সেসব চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে আপনি কোনও সদিচ্ছা দেখালেন না কেন? আপনি বিজ্ঞানী, গবেষকদের আহ্বান করলেন ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করতে। কিন্তু গন্ডগোলটা কোথায় জানেন তো? ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথস, যেসব জায়গায় অযৌক্তিক বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই, দেশের সরকার সেগুলোতেই নানাধরনের অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও গোমূত্রের নামে, কখনও থালা বাজানোর নামে, কখনও অন্য কিছুর নামে। গবেষকরা তাঁদের প্রাপ্য ফেলোশিপ থেকেও বঞ্চিত

হচ্ছেন। অন্যদিকে বন্ধুত্ব, প্রেম, নাগরিক জীবন, এসব ক্ষেত্রে, যেখানে পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এগুলো খুব জরুরী, সেখানেও এই সরকার ক্রমাগত জাত-ধর্ম-লিঙ্গগত বিদ্বেষের ধারণাকে উস্কানি এবং উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। জীবনে যুক্তির স্থান আর বিশ্বাসের স্থান যেখানে যেখানে হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তার উল্টোটা। এরপরেও কি গবেষণায় এগিয়ে আসার আহ্বান বিশেষ কার্যকরী হবে? হওয়া সম্ভব?

যেসব চুরি লকডাউনে বেড়ে গেল

লকডাউনের সময়ে অনলাইন ক্লাস, বিজনেস মিটিং, এইসবের জন্য zoom নামের অ্যাপটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এমনকি যোগা ক্লাস, জন্মদিন পালন, এইসবের জন্যও zoom ব্যবহার করা হচ্ছে। কেবলমাত্র ভারতেই মার্চ মাসে ২৩ লক্ষ নতুন গ্রাহক যুক্ত হয়েছে এই অ্যাপে। IIT, NIT-র মত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। IIEST শিবপুরের মত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান তো zoom ব্যবহারের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকাও জারি করেছে। কিন্তু জনপ্রিয়তার সাথে সাথে এই অ্যাপ তথ্য চুরি নিয়ে বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েছে। এপ্রিলের শুরু থেকে সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, জার্মানি, তাইওয়ানের মত নানা দেশের সরকার সরকারি কাজকর্ম, মিটিং, অনলাইন ক্লাস এসবের জন্য zoom অ্যাপ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ অনলাইনে তথ্য চুরি। এমনকি ৫ই এপ্রিল zoom নিজেও মেনে নেয় যে zoom তার গ্রাহকদের থেকে ফেসবুকের তথ্য চুরি করে। ৮ই এপ্রিল আমেরিকার ফেডারাল কোর্টে zoom অ্যাপের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলা করেন zoom-এরই একজন শেয়ার হোল্ডার মাইকেল ড্রিউ। চুরি করা তথ্য বিক্রি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে। এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। তথ্য চুরির অভিযোগে টিকটক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নানা দেশ। এমনকি ফেসবুক, গুগলের মত বড় বড় কোম্পানিগুলোও তথ্য চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত। সেসব নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক, জরিমানা, ইত্যাদির গল্প রয়েছে। শুধু বেসরকারি অ্যাপ নয়, আধারের মত সরকারি উদ্যোগের তথ্যগ্রহণ নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। এমনকি, নানা আন্তর্জাতিক আদালত এ নিয়ে ভারত সরকারের সমালোচনাও করেছে। আজকের এই zoom অ্যাপের তথ্য চুরির ঘটনা এই বিতর্কে সাম্প্রতিকতম সংযোজন মাত্র। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এই অ্যাপগুলো তথ্য চুরি করে কী করে?

ধরুন আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার জানতে চাইলেন, আপনার কবে থেকে জ্বর হচ্ছে। এখন আপনি যদি এই তথ্য না দেন তাহলে ডাক্তারের উপদেশ বা পরিষেবা কোনওটাই পাবেন না। কিন্তু জ্বর দেখতে গিয়ে ডাক্তার যদি আপনাকে আপনার প্রেমের কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে কি আপনি সেটাকে অভদ্রতা বলবেন না? কিংবা ধরুন আপনি ওলা বা উবের বুক করেছেন বা কোনও ক্যুরিয়ার সার্ভিস নিতে চান। তখন তো আপনাকে আপনার অবস্থান-সংক্রান্ত তথ্য দিতেই হবে। নাহলে পরিষেবাটাই তো আপনাকে দেওয়া সম্ভবপর হবে না। অবস্থান তো না হয় পরিষেবার জন্য লাগবে বুঝলাম। কিন্তু ওই অ্যাপ যদি এরপর আপনার গ্যালারির ছবি চায়, তবে তা হবে অপ্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া। আর এই অপ্রয়োজনীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহই হল তথ্য চুরি। তারমানে কিছু তথ্য হয় যা পরিষেবাটার জন্য

প্রয়োজনীয় আর কিছু তথ্য হয় যা পরিষেবাটার জন্য প্রয়োজনীয় নয়, সেগুলি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য। প্রায় সমস্ত মোবাইল অ্যাপগুলোতেই দেখবেন, ব্যবহারের সময় অ্যাপটা অপ্রয়োজনীয় নানা কিছুর পারমিশন চায় আপনার থেকে। আর আপনিও অনেকসময় খেয়াল না করে সেগুলো অ্যালাও করতে থাকেন। ভালো করে যদি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, অ্যাপটা যা যা কিছুর পারমিশন চাইল আর আপনি অ্যালাও অপশন টিপে অ্যালাও করলেন, তার সবকিছু অ্যাপটার পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন নেই। ধরুন আপনি জোম্যাটো অ্যাপ ব্যবহার করবেন, কোনও রেস্টুরেন্ট থেকে কোনও ডেলিভারী বয় আপনার ঠিকানায় খাবার দিয়ে যাবে। এই পরিষেবার জন্য আপনার থেকে টাকা আর আপনার দেওয়া লোকেশন নিলেই জোম্যাটো কাজ মিটে যায়। কিন্তু দেখবেন জোম্যাটো আপনার কনট্যাক্ট আর স্টোরেজের তথ্য নেবে। মোবাইলের স্টোরেজের তথ্য নেওয়া মানে আপনার ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও, অফিসের কাগজ, এককথায় বললে আপনার পার্সোনাল ডায়রি কাউকে আপনি দিয়ে দিলেন। আপনি যদি খেয়ালও করেন, অনেক অ্যাপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা বাধ্য করে বাড়তি তথ্য দিতে। নইলে আপনাকে সেই অ্যাপ আর ব্যবহারই করতে দেওয়া হয় না। এত গেল বলে চুরির কথা। আসল চুরি তো হয় আপনাকে না বলে। বলে যদি ২০% চুরি হয় তবে না বলে হয় ৮০%। এমন কিছু অ্যাপ আছে যা আপনার হাতে বা পড়ার টেবিলে থাকা মোবাইল থেকে আপনার অজান্তেই মোবাইলের ক্যামেরা অন করে দেবে এবং আপনার ভিডিও বহু দূরে থাকা কোন কোম্পানির কাছে চলে যাবে। এবং আপনার ফোনে তার কোনও প্রমাণও থাকবে না। এ হল না বলে করা চুরি। আপনার প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি একটা সাধারণ মানুষ, আমার এটিএম-এর পিন জানতে চাইলে আমার সমস্যা এছাড়া অন্য কোন তথ্য নিয়ে কেই বা কী করবে? আর তাতে আমারই বা ক্ষতি কী? এই প্রশ্নটাই নাগরিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার সর্বক্ষণের খবর, ভালো-মন্দ, রুচি, চাহিদা, মনখারাপ, সম্পর্ক, এসব জানতে চাইতে পারে দুই ধরনের লোক। হয় আপনার অত্যন্ত প্রিয়জন, নাহলে আপনার চরম শত্রু। আপনার প্রিয়জন জানতে চায় আপনার যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জোম্যাটো, ফেসবুক, গুগল, ওলা, সরকার, কোন উদ্দেশ্য থেকে এইসব তথ্য জানতে চায়? সেটা আমাকে-আপনাকেই ভেবে বার করতে হবে। সোজা উত্তর যেটা পাওয়া যায়, কিছু বিক্রির ধান্দায়। বলা যায় জোর করে কেনবার চাহিদা তৈরী করার ধান্দায়। একটা উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করি বিষয়টা। ওলা অ্যাপ আপনার মোবাইল ব্যাটারির চার্জের তথ্য নেয়। খেয়াল করে দেখুন, এই তথ্য আপনার পরিবারের লোকজনের লাগতে পারে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন, "মোবাইলে চার্জ দিয়েছিলি তো?" যাতে প্রয়োজনে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়। প্রিয়জনের যা কাজ আরকি! কিন্তু ওলা-উবের এই তথ্য কেন নেয়? আপনি ধরুন ব্যস্ততার মধ্যে ওলা বুক করছেন আর আপনার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। ওমনি ওলা বুঝে গেল, অটোতে গেলে কত ভাড়া, বাস দিয়ে গেলে কত সময়, উবের বুক করলে কত লাগবে এসব নিয়ে আপনার কাছে বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই কারণ আপনি চাপে আছেন যে এসব দেখতে গিয়ে ফোনটা সুইচ অফ হয়ে গেলে আপনার আর কিছু করার নেই। তাই আপনাকে এই সুযোগে ওলা বাড়তি ভাড়া দেখাবে। যাতে ওই বাড়তি ভাড়াতেই বুক করতে আপনি বাধ্য হন। এবার নিশ্চয়ই বোঝা গেল, ওলা কেন আপনার ব্যাটারির

তথ্য জানতে চায়।

সর্বক্ষণ আপনার সবকিছু জানতে পারলে এই জাতীয় আর কী কী যে সুবিধে হতে পারে কোম্পানিগুলোর, তা আপনাকেই অনুমান করে বের করতে হবে। কোম্পানিগুলোও এর সবটা জানে না। এই নিয়ে তারাও গবেষণা চালাচ্ছে। ধরুন আজ আপনার জন্মদিন, আপনি ওলা বুক করে রেস্তোরাঁয় খেতে যাচ্ছেন। তাই আপনি আজ বেশি ভাড়া দিয়েও যেতে পারেন। এমনিতে আপনার জন্মদিন জানা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এবার বুঝতে পারবেন ব্যবসায় ওলার আপনার জন্মদিনের তথ্যও কাজে লেগে যেতে পারে। এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, সাদা চোখে অপ্রয়োজনীয় তথ্যই কীভাবে একটু একটু করে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে কোম্পানিগুলির কাছে। আপনার জন্মদিনের সুখের মুহূর্ত আর আপনার ব্যাটারি ফুরোনোর বিপদের মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বাড়তি মুনাফা করা যায় তার জন্য। শুধু কি সুখ বা বিপদ! তারা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে কীভাবে আপনার রুচি, রাগ, গোপন ইচ্ছা, হতাশা এসবকে বুঝে বিন্দু বিন্দু করে বাড়তি মুনাফা বার করা যায় আপনার থেকে।

শুধু ব্যবসার কোম্পানিগুলো নয়, আপনার প্রতি মুহূর্তের খবর, প্রকাশ্য বা গোপন, সব ধরনের খবর চায় রাজনৈতিক দলগুলো, সরকারও। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যাটারি বা জন্মদিন এসব ওলা কোম্পানির কাজে লাগলেও সরকারের তো এসব নিয়ে চিঁড়ে ভিজবে না। তাহলে এদের এসব নিয়ে কী হবে? আজকের এই আধুনিক সময়কে বুঝতে গেলে, এই প্রশ্নের উত্তরও আপনাকে অনুমান করে বের করতে হবে। আপনাকে সাহায্য করতে পারি দু-একটা তথ্য দিয়ে। Cambridge Analytica বলে একটা কোম্পানি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ডে সরকারে থাকা দলকে নির্বাচনে পুনর্বার জয়ী করার বরাত নিয়েছিল বিশাল টাকার বিনিময়ে। তাদেরই এক কর্মচারী পরে Cambridge Analytica-র এই কর্মকান্ডকে ফাঁস করে। ফেসবুকের লাইক, শেয়ার, কমেন্ট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কোন কোন ক্ষোভ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ইত্যাদি কোন গতিতে, কোন অঞ্চলে, কোন বয়সের মধ্যে বাড়ছে তার গাণিতিক সূত্র আগে থেকেই যাতে বোঝা যায়, তাই নিয়ে পৃথিবীর বহু নামিদামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলছে। বুঝতেই পারছেন, শাসক দলগুলোর ক্ষেত্রে এই ধরনের গবেষণা কতটা লাভজনক হতে পারে।

আজকের এই আধুনিক যুগে ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল ক্ষেত্রকে খুঁটিয়ে বোঝা, তার ভালো দিক, মন্দ দিককে ব্যবহার করতে পারে কে আর কেই বা ব্যবহৃত হতে পারে, সেসব বোঝা ছাড়া মানুষের কাছে আর উপায় নেই। যতদিন না সাধারণ মানুষ এসব বুঝে সচেতন হচ্ছেন, ততদিন নানাভাবে আমরা শোষিত, ব্যবহৃত হব, বোকা বনতে থাকব। তাই ডিজিটাল ইন্ডিয়া নয়, চাই ডিজিটাল-কনশাস ইন্ডিয়া। মানুষকে অসচেতন রেখে যদি ডিজিটাল ইন্ডিয়া হয় তাহলে আপাত সুবিধার আড়ালে সাধারণ মানুষ একটা অদৃশ্য ফাঁদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। ভারত সরকারের সম্প্রতি বের করা আরোগ্য সেতু অ্যাপ নিয়েও এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠছে।

লকডাউনে ভারতীয় মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া

একবার জিওলজি বিভাগের ফিল্ড সার্ভেতে ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে চল্লিশজন গিয়েছিলেন ওড়িশার জঙ্গলে। সার্ভে চলাকালীন একদিন এক ছাত্র হারিয়ে যায়। সবাই কাজকর্ম ফেলে তাকে খুঁজতে থাকেন। হারানো ছাত্রকে নিয়ে

অনেকে আবার বিরক্তিও প্রকাশ করেন কারণ আগেও দু-একবার সে এরকম করে সবাইকে সমস্যায় ফেলেছে। শিক্ষকরা তখন ভাবছেন থানায় খবর দেবেন কিনা।

পরে যদিও জানা গেল আসল ঝামেলায় পড়েছিলেন স্থানীয় থানার পুলিশ। নিখোঁজ ওই ছাত্র স্থানীয় থানায় পৌঁছে পুলিশকে বলে যে সে তার ৩৯ জন সাথীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করতে চায়। পুলিশ অফিসার যত বোঝানোর চেষ্টা করেন, "আপনি চলুন আমার সাথে, আপনাকে হস্টেলে পৌঁছে দিচ্ছি", ছাত্রটি ততই নাছোড়বান্দা। নিখোঁজ ৩৯ জন সাথীকে খুঁজে বের করার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না পুলিশ, এই বলে সে কাজে গাফিলতির অভিযোগ করতে থাকে। পুলিশ অফিসার ছাত্রটিকে পাগল বলেছিল কি না জানি না, তবে একই ঘটনাকে কত পৃথকভাবে দেখা যায়, কত পৃথক অভিযোগ করা যায়, তার একটা দারুণ উদাহরণ এই গল্পটা।

বান্দ্রা স্টেশন চত্বরও বান্দ্রার হাজিদ মসজিদের লাগোয়া। হেঁটে দুই মিনিটের এদিক-ওদিক। একই ভিড়কে স্টেশনের সামনের ভিড়ও বলতে পারেন আবার মসজিদের সামনের ভিড়ও বলতে পারেন, আগে বলা ওই গল্পটার মতই। আজকের জাতীয় মিডিয়া ও শাসক দলের আইটি সেল ওই ভিড়কে মসজিদের সামনের ভিড় বলে প্রচার করতে পারে এবং লকডাউনের সময় লকডাউন ভাঙবার ষড়যন্ত্র বলেও অভিযোগ করতে পারে। বাস্তবে ঘটেছেও তেমনটা। ঘটে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়া ও বড় কর্পোরেট মিডিয়ায় প্রচার হওয়া ৯০% খবর খুঁটিয়ে দেখলে এই খেলাটাই বারবার চোখে পড়বে আপনার। তথ্যের উপস্থাপনায় ছোট্ট একটা স্পিন। আর আপনি ক্লিন বোল্ড।

আজকালকার নিউজ রিপোর্টাররা স্পিনের ব্যাপারে শেন ওয়ার্ন বা মুরলীধরণকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমরাও প্রাত্যহিক জীবনে লোকের কান ভারী করতে একই তথ্যকে প্রয়োজন মত একটু স্পিন করাই না কি? সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখলেই বুঝবেন সাংবাদিকতার নামে অজস্র স্পিনার প্রতিদিন খেলে চলেছে। আর আমার-আপনার মত কোটি কোটি মানুষ স্রেফ ক্লিন বোল্ড।

এটা তো গেল তথ্যকে হাজির করা, পরিবেশন করার পিছনে কাজ করতে থাকা অসৎ উদ্দেশ্যের কথা। এবার বলি পুকুর চুরির কথা। মানে সোজাসুজি তথ্য বিকৃতির কথা। আপনাদের ৫ থেকে ৯ এপ্রিল জনপ্রিয় কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বেরোনো কিছু খবরের হেডলাইন বলি।

- রায়পুর এইমস হাসপাতালে ডাক্তারদের গায়ে থুথু ছিটিয়ে হামলা নিজামুদ্দিন ফেরত এক নাবালকের।
- ফিরোজাবাদে চার নিজামুদ্দিন ফেরত করোনা রোগীকে মেডিক্যাল টিম আনতে গেলে তাদের উপর পাথর ছোঁড়া হল।
- নিজামুদ্দিন ফেরত মধ্যপ্রদেশের নুর মহম্মদ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।
- অরুণাচল প্রদেশে নিজামুদ্দিন ফেরত ১১ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

যদিও এই প্রতিটা খবরের ক্ষেত্রে দেখা যাবে পরে কখনও সরকার, কখনও পুলিশ, কখনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এই প্রতিটা খবরই সর্বৈব মিথ্যা। এই তালিকা আর দীর্ঘ করতে চাইনা। উপরের ঘটনাগুলোতে দু-একটা ক্ষেত্রে দুঃখপ্রকাশ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিডিয়া হাউজগুলো মিথ্যা খবরের জন্য দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমা চাওয়া কিছুই করেনি। কোটি কোটি

মানুষের কাছে প্রতিদিন এই জাতীয় মিথ্যা প্রচার এত মসৃণ ও স্বাভাবিক গতিতে হয়ে চলেছে যে, আপনার মনে হবে দেশে কোনো আইনকানুন নেই, সরকার-পুলিশ সব মারা গিয়েছে। মিথ্যা তথ্য আর তথ্যের সুকৌশলী পরিবেশন, এটাই এখনকার সাংবাদিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যদি সোশ্যাল মিডিয়ার কথাই বলেন, 'চেক ফর স্ক্যাম' নামে এক ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র তাদের কাছেই প্রত্যেক মাসে ৫-৬ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। সম্প্রতি বান্দ্রার ঘটনায় শুধু মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছেই ১০০টির মত ফেক নিউজের অভিযোগ আসে। ফেক নিউজকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সবচেয়ে সহজ কৌশল হল, কোনও ছবি বা ভিডিওকে কৌশলে ব্যবহার করা। নিজের চোখে যা দেখি তা ভুল হতে পারে না, আমাদের এই সহজ বিশ্বাস বা অভ্যেসকে এই মিডিয়া-আইটি সেলগুলো কাজে লাগায়। বেসরকারি সূত্র মতে, গত ১০ বছরে ভারতে প্রচারিত হওয়া ফেক নিউজের ৯০% হল মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে। আর এসব দেখেও আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে আগামী দিনে এই কর্পোরেট মিডিয়া প্রয়োজন পড়লে আপনার বিরুদ্ধে, আপনার তোলা ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে, আপনার মাতৃভাষার বিরুদ্ধে, আপনার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই কাজটাই করতে থাকবে। তখন কিন্তু বিরোধিতা করার জন্য পাশে কাউকেই পাবেন না।

যাঁরা করোনা সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন, রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারছেন না, তাঁদের বলব টিভি নিউজ দেখুন। দেখবেন করোনা সঙ্কট বলে কিছু নেই একটা চলছে, সেটা খানিকক্ষণ বাদেই ভুলে গেছেন। কেন বলছি এমন? তাহলে শুনুন জনপ্রিয় এক টিভি চ্যানেলের গত তিনদিনের ডিবেটের বিষয়।

২০শে এপ্রিল: Who tried to downplay lynching?

২১শে এপ্রিল: No end to Mamata's blocked politics. Lobby joins hands with Pakistan and Owaisi.

২২শে এপ্রিল: India wants Palghar truth! Will Sonia end silence?

আরও কিছু জনপ্রিয় চ্যানেলের হেডলাইন এবার শুনে নিই।

১৮ই এপ্রিল: জামাত সে ঘিরে রোহিঙ্গা পার্ আটকে।

২০শে এপ্রিল: করোনাকা ধরম ক্যায়সে পাতায়া?

২১শে এপ্রিল: জামাতওয়ালো আব তো শুধর যাও!

২২শে এপ্রিল: সন্তো কি ক্যায়া শুনেগি সরকার?

কোথাও করোনার 'ক' ও নেই, তাই ভয় পেয়েও লাভ নেই। শুধু ষড়যন্ত্রের 'ষ' আছে। আপনার করোনা আতঙ্ক ভোলাতে এর থেকে ভালো কী হতে পারত?

অনেকে আবার এই ধরনের হিংসাত্মক খবরে বিরক্ত বোধ করেন। তাদের জন্য খোঁজ করতে গিয়ে অন্য একটা উদাহরণ পেয়েছি। আপনারা করোনা আতঙ্ক ভুলে থাকতে ট্রাই করতে পারেন এই ভিন্ন স্বাদের খবর। শুনে নিই খবরটা।

গত ১৪ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ৩মে অবধি লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর পর জনপ্রিয় এক নিউজ চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজে খবর হয়, "৩মে তাক্ কিউ? আপ লোগো কো জানকারি দে দেতে হ্যায়। ১মে, মে ডে কা ছুট্টি, ২মে স্যাটারডে, ৩মে রবিবার, ৩মে এক সোচি সামঝি সোচ কা নাতিজা।"

অন্য এক জনপ্রিয় চ্যানেলে খবর হয়, "৩মে তাক্ কিউ? আপ লোগো কো জানকারি দে দেতে হ্যায়। ১মে, মে ডে কা ছুট্টি, ২মে স্যাটারডে, ৩মে রবিবার, ৩মে এক সোচি সামঝি সোচ কা নাতিজা।"

আর একটা চ্যানেলের সঞ্চালক দর্শকদের জানান, ১৪ তারিখের ভাষণে মোদি মোট ৭ বার হাত জড়ো করেছিলেন, আর ৩মে নিয়ে বলেন, "৩মে তাক্ কিউ? আপ লোগো কো জানকারি দে দেতে হ্যায়। ১মে, মে ডে কা ছুট্টি, ২মে স্যাটারডে, ৩মে রবিবার, ৩মে এক সোচি সামঝি সোচ কা নাতিজা।" আর একটি হিন্দি চ্যানেল জানায়, "৩মে তাক্ কিউ? আপ লোগো কো জানকারি দে দেতে হ্যায়। ১মে, মে ডে কা ছুট্টি..." এতে যদি আপনার বিরক্ত লাগে তাহলে আপনার বিরক্তি আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে জানাই, এই একই বয়ান মোট ৯টি হিন্দি চ্যানেলে খবর হিসাবে প্রচারিত হয়েছে। হয় ঘৃণা-ষড়যন্ত্রের প্রচার, নাহলে না-খবরকে খবর করে তোলা। এই হল আজকে আমাদের দেশে সাংবাদিকতার চেহারা।

পোস্টমর্টেম একটা জটিল ব্যাপার। ধরুন, জীবিকায় কৃষক এক ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন। পরের বছর খরার কারণে ধার শোধ করা তো দূরে থাক, আরো ঋণে জড়িয়ে পড়লেন। সরকারের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পেলেও এই পরিবার অনাহার ঠেকাতে পরল না। খিদের জ্বালায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ভর্তি হল হাসপাতালে। মৃত্যু হল কৃষকের। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানালো কৃষকের মৃত্যুর কারণ ফুড পয়জনিং। নিউজ শুনে আপনিও জানলেন, ফুড পয়জনিং-এ মৃত কৃষক। চাপা পড়ে গেল অনাহারের খবর। চাপা পড়ে গেল সরকারের থেকে সাহায্য না পাওয়ার ঘটনা। চাপা পড়ে গেল সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সুযোগ না পাওয়ার ঘটনা। মৃত্যুর কারণ পোস্টমর্টেম করার সময় তাই সাবধান থাকুন। নাহলে ভুল হতে পারে প্রতিমুহূর্তে। এই লকডাউনে অনাহারে মৃত্যুর খবর হয়তো আপনার কানে পৌঁছেছে। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত খাদ্য সংকটের খবর তো প্রতিদিনই পাচ্ছেন। অনেকে আশঙ্কা করছেন, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা আরও বাড়তে পারে। খবর যেভাবেই আমাদের কাছে পরিবেশিত হোক না কেন, নাগরিক হিসেবে পোস্টমর্টেমের দায় আমার-আপনার থেকেই যাবে। UNA-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, একজন মানুষের প্রতিদিন গড়ে ৪২০ গ্রাম খাদ্যশস্য লাগে। ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হিসেব ২০১৯ সালে ছিল মাথাপিছু দৈনিক প্রায় ৪৯০ গ্রাম। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন হলেও UNA-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ভারতবর্ষে ২০ কোটি মানুষ অর্ধাহারে বা প্রায় অনাহারে দিন কাটিয়েছেন। তখন তো দেশে লকডাউন ছিল না, তারপরেও কেন ২০ কোটি মানুষ অর্ধাহারে থাকতেন? কেন খাদ্যসুরক্ষা তালিকায় ভারতের স্থান ১০২ নম্বরে? এই মানুষদের কি রেশন কার্ড ছিল না? এদের জন্য কি সরকারের কোনও ঘোষণা, যোজনা ছিল না? সরকার এর উত্তর কী দেবে জানি না, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এদের সঙ্কট নিয়ে কোনও ভিডিও হয়নি। আমাদের চোখেও পড়েনি, স্বাভাবিক দিনগুলোয় হাজির থাকা খাদ্যসঙ্কটের এই উৎকট, উদ্বেগজনক ছবিটা। হিসেব বদলে দিয়ে গেল করোনা। কর্পোরেট মিডিয়া খবর না করলেও দেশের নানা প্রান্ত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় খাদ্যসঙ্কটের কথা জানিয়ে ভিডিও ছাড়ছেন সাধারণ মানুষ। ভাইরালও হচ্ছে সেসব। প্রশাসন, নেতা, মন্ত্রী, খাদ্যসঙ্কটের পেছনে লকডাউনকে কারণ হিসেবে দেখাতেও শুরু করে দিয়েছেন। লকডাউন সঙ্কটকে বাড়িয়ে দিয়ে থাকলেও লকডাউনই মূল কারণ

কিনা, এই প্রশ্ন আমাদের সকলকেই ভাবাবে।

আপনাদের এ কদিনের খবরের কিছু হেডলাইন দেখাই।

১) ফেরার পথ নেই, পুলিশের তাড়া খেয়ে জঙ্গলেই আত্মগোপন পরিযায়ী শ্রমিকদের।

২) খাবারটুকুও নেই, বাড়ি ফিরতে চান ওঁরা। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় হাজার হাজার শ্রমিকের ভিড়।

৩) গায়ে জ্বর, ভুখা পেটে যমুনার ধারে অসহায় শ্রমিকের দল।

৪) একমুঠো ভাত খেয়েছে, দুধও নেই, একদিনের বাচ্চাকে কী খাওয়াব?

৫) দিল্লী থেকে মধ্যপ্রদেশ বাড়ি ফেরার চেষ্টা। ২০০ কিলোমিটার হেঁটে রাস্তাতেই মৃত্যু যুবকের।

একদিকে যেমন এই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকের কিছু খবর একঝলকে দেখে নিই।

১) হরিদ্বারে আটকে থাকা ১৮০০ তীর্থযাত্রীকে গুজরাট ফিরিয়ে আনা হল ২৮টি বাসে করে।

২) কোটাতে পড়তে গিয়ে আটকে পড়া নেতা-মন্ত্রী, শিল্পপতিদের ৭০০০ ছেলেমেয়েকে ২৫০টি বাসে করে ফেরানোর ব্যবস্থা উত্তরপ্রদেশ সরকারের।

৩) Amid COVID-19, India Buys $116M worth of weapons from Israel.

৪) কর্ণাটকের কালবুর্গিতে করোনা হটস্পট অঞ্চলে মন্দিরের রথ উৎসবে কয়েকশো মানুষের ভিড়।

৫) The Finance Ministry approves Rs 375 Crores for 'Mahakumbh' in Uttarakhand's Haridwar.

খবরের ভিড়ে চাপা পড়বেন না, প্রতিটা খবরই নতুন বার্তা বয়ে আনে। এইসব খবর শুনে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কোটা থেকে ফেরানো গেলে আটকে থাকা শ্রমিকদের কেন ফেরানো যাবে না? নিজামুদ্দিনে সরব মিডিয়া কর্ণাটকের রথযাত্রা নিয়ে প্রায় নীরব কেন? কুম্ভমেলা, অস্ত্র চুক্তিতে যদি খরচ করা সম্ভব হয় তবে গরীব মানুষের জন্য কেন মাত্র ১.৭ লক্ষ কোটির প্যাকেজ, যার মধ্যে আবার পুরনো স্কিমই ভর্তি?

আবার এরই মাঝে ফ্রান্সের সেন্ট বার্থেলেমি শহরে ম্যাকডোনাল্ডস্ শ্রমিকরা রেস্টুরেন্ট দখল করে সেখান থেকে খাবার ভাগ করে দিচ্ছে প্রতিবেশীদের মধ্যে। শহরের সমস্ত মানুষের সহযোগিতায় চলছে সেই কর্মকান্ড। রেস্টুরেন্টের বাইরে বোর্ড ঝুলিয়ে তারা বলছে,

We want equal rights for everyone, everywhere.

We live here, we work here, we're staying here.

মিডিয়া নিয়ে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা আমরা শেষ করব মহারাষ্ট্রের পালঘরে লকডাউনের মধ্যেই ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ও নিন্দনীয় গণপিটুনির ঘটনাটি দিয়ে।

মিডিয়া মারফত আপনারা যা দেখেছেন, আমরাও তাই। চলুন মিডিয়া মারফত পাওয়া খবরগুলোকেই আমরা একসাথে বুঝে নিই। মহারাষ্ট্রের পালঘরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক গণপিটুনির আগে ওই অঞ্চলে

একটা গুজব লোকজনের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল। বাচ্চা চুরি বা কিডনি চুরির গুজব। এই গুজবের কথা সমস্ত সাংবাদিকদের লেখাতেই উঠে এসেছে। ঘটনা এই গুজব থেকে শুরু হলেও, বড় মিডিয়াগুলো খবরে এ নিয়ে এক লাইনেরও বেশি আর খরচ করেনি। আমি-আপনিও গণপিটুনির খবরের উত্তেজনায় গা ভাসিয়ে ফেলেছি। কোন খবরের শিকড় যে কত গভীরে লুকিয়ে থাকে, সেই সত্যকে খুঁজে বের করার দায় এইসব সাংবাদিক আর কর্পোরেট মিডিয়ার নেই। নয়তো ওই অঞ্চলে বাচ্চা চুরি, কিডনি চুরি নিয়ে কেন এত আতঙ্ক, কেন গ্রামের লোক এই আতঙ্কে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিচ্ছিলেন, তা নিয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামাতে দেখতাম। হত্যার ঘটনা যদি না ঘটত, তাহলে গ্রামের মানুষগুলোর রাতের পর রাত দুশ্চিন্তায় কাটানোর খবর সামনেই আসত না। যদিও একলাইনের বেশি জায়গা করে নিতে পারেনি এই খবর। খেয়াল করে দেখুন, গত পাঁচ বছরে এই ধরনের গুজব কী পরিমাণে বেড়ে গেছে আমার আপনার চারপাশে! দিনে দিনে ভারতবর্ষ কি একটা গুজবের দেশে পরিণত হচ্ছে না? সাধারণ ভারতবাসীর মনে সবসময় একটা গুজব বা ষড়যন্ত্রের কথা এত দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে কী করে? না, শুধু আমি আপনি নয়, মিডিয়া থেকে প্রশাসন কেউই এই দিকটা নিয়ে এতদিন একটাও কথা বলেনি। কর্পোরেট মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, সর্বত্রই আপনাকে একই ষড়যন্ত্রের কথা শোনানো হয়েছে। শুনিয়ে শুনিয়ে পালঘরের মত আর কত কত গ্রামকে যে এই জায়গায় নিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত কত গ্রাম যে এইভাবে রাত্রে ঘুমোতে পারছে না, তার ইয়ত্তা নেই। কখনও লাভ জেহাদ, তো কখনও টুকরে টুকরে গ্যাং, কখনও নিজামউদ্দিনের ষড়যন্ত্র, তো কখনও দেশদ্রোহীদের সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক। কখনও পাকিস্তান, তো কখনও মুসলিমদের বেশি বাচ্চা নেওয়ার ষড়যন্ত্র। কখনও থুতু ছিটিয়ে করোনা প্ল্যান তো কখনও জোম্যাটোতে গরুর মাংস বিলি। কর্পোরেট মিডিয়া থেকে শুরু করে হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক দিয়ে সর্বক্ষণ আমাকে-আপনাকে শোনানো হচ্ছে নানা ষড়যন্ত্রের কাহিনী। আর বলা হচ্ছে তৈরী হতে যুদ্ধের জন্য। আমরা কেউই জানি না, আজকেও পালঘরের মত অন্য কোনও গ্রাম, অন্য কোনও একটি গুজবে রাত জাগছে কি না!

কীভাবে ভারতবর্ষ একটা গুজবের দেশে পরিণত হল গত কয়েকবছরে, এ নিয়ে talk-show হওয়া উচিত ছিল, এ নিয়ে আসা উচিত ছিল post-edit। কিন্তু যারা এটা তৈরি করেছে, তাদের দিয়ে কি আর এর শিকড় খোঁজা সম্ভব? কেউ কেউ বলছেন, ওই অঞ্চলে বাচ্চা চুরির গুজব ছড়াতো আসলে একটা আইটি সেল। তাদের মেসেজ ছিল, ওই অঞ্চলে মুসলমানদের একটা গ্রুপ বাচ্চা চুরির জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আইটি সেলের ছড়ানো গুজবের জেরেই কি ঘটে গেল এরকম মর্মান্তিক ঘটনা? এই খবরকে যদি সত্যি বলে নাও ধরি, তাহলেও প্রশ্ন, দেশে গণপিটুনির মানসিকতার এই যে বাড়বাড়ন্ত, তার কারণ অনুসন্ধান না করে নিরপরাধ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো কেন?

যাইহোক, এবার আমরা দেখে নেবো পালঘরের ঘটনার পর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার হেডলাইনগুলো।

১) পুলিশ কি মজুদগী ম্যায় হুই সাধুও কি হত্যা।

২) পালঘর ম্যায় সাধুও কি হত্যা এক সাজিস।

৩) পালঘর ম্যায় সাধুও কি মবলিঞ্চিং পর সাওয়াল পুলিশ

পর।

আপনারাও এসব শুনেছেন, দেখেছেন। ভেবে দেখুন, সাধুর হত্যা; এমনভাবে শিরোনাম হচ্ছে যা শুনে আজকের ভারতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণেই ঘটনাটিকে দেখে ফেলবে বহু মানুষ। কর্পোরেট মিডিয়া কি সেটাই সচেতন ভাবে চাইছে না? "সাধুর হত্যা কাদের ষড়যন্ত্র?" বলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়াচ্ছে না তারা? আর সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টা করতে করতে এমন হয়েছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি নিলেশ তেলওয়ারের মৃত্যুর খবর হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন। কারণ, তাঁর পরনে কোনও গেরুয়া বসন ছিল না। তাই তাঁর মৃত্যুর কোনও নিউজ ভ্যালু নেই। তাঁর মৃত্যু শুধু কোল্যাটারাল ড্যামেজ বা আশেপাশের ঘটনা। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় আইটি সেলের কথা তো ছেড়েই দিন, তারা নানা তথ্য বিকৃত করে প্রতিদিন যা চালায় তাই চালিয়েছে এক্ষেত্রে। কিছু কর্পোরেট মিডিয়া প্রথমে সাম্প্রদায়িক রং দিলেও, পরে কথা বদলে নেয়। কেউ কেউ ট্যুইট ডিলিটও করে দেয়। যদিও এদের আর কোনও লাজলজ্জা নেই। যেকোনও মিথ্যে কথা প্রচারের অভিযোগ উঠলেই তারা সেটা ডিলিট করে দেয় আবার পরক্ষণেই আরেকটা মিথ্যা সগর্বে প্রচার করে চলে।

আরেকটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে সরব হন যে বুদ্ধিজীবীরা, তাঁরা কেন পালঘরের ঘটনায় নিশ্চুপ? এই নিয়ে নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন এক সাংবাদিক। ওই সাংবাদিক এটাই ভুলে গেছেন, পালঘরে কোনও সাম্প্রদায়িক হিংসা ঘটেনি। যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনও ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়া কোনও সাংবাদিকের কাজ হতে পারে না। ওনার নিউজে উনি যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যারা মার খাচ্ছে তাদের পোষাকের রঙ দেখুন, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাঁরা গেরুয়া পরে আছেন। এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায়, কারা মার খাচ্ছে আর কারা মারছে। খুব ছেলেমানুষী যুক্তি দিয়ে ফেললেন না কি? আর যাই হোক, ওনাকে তো ছেলেমানুষ বলা যায় না। তাই স্পষ্টই বোঝা যায়, একটা ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টা চালাতে কতটা মরিয়া, কতটা নোংরা হতে পারে একজন সাংবাদিক। বাংলায় একটা কথা আছে, "পাপ বাপকেও ছাড়ে না।" গণপিটুনিকে এরা যেভাবে স্বাভাবিক জনজীবনের অংশ করে তুলেছে, গুজব-ষড়যন্ত্র-বিদ্বেষের এরা যা ফাঁদ পেতেছে, এই ফাঁদে শুধু কোনও বিশেষ সম্প্রদায় নয়, পড়বে আরো অনেকেই।

আপনাদের সঙ্গে আরও কিছু তথ্য শেয়ার করে নিই।

১) সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে ভারতে বেড়ে চলা গণপিটুনির ঘটনাকে নিন্দা জানিয়ে সরকারকে গণপিটুনি বিরোধী আলাদা আইন আনার পরামর্শ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থান বিধানসভায় অ্যান্টি-মবলিঞ্চিং বিল প্রস্তাবিত হয়। রাজস্থানে এই বিলের বিরোধিতা করে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে আনা মবলিঞ্চিং বিলে বিজেপি সমর্থন জানানো থেকে বিরত থাকে। এই দুই রাজ্য থেকে পাশ হওয়া বিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো হলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এখনও তা মঞ্জুর করেনি। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই বিল নিয়ে বিজেপির এত সমস্যা কেন?

২) The Quint-এ প্রকশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ থেকে গণপিটুনিতে আমাদের দেশে মারা গিয়েছেন ১১৩ জন মানুষ।

৩) ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো তাদের রিপোর্টে মবলিঞ্চিং-এর ঘটনাকে আলাদা করে নথিভুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেও গত তিন বছরে এ বিষয়ে তারা কোনও নথিভুক্তকরণ করে উঠতে পারেনি।

অর্থনীতি, চিকিৎসা ও গবেষণা— ভারতবর্ষের হাল

বিপুল শক্তিধর দেশ আমাদের এই ভারত করোনার বিরুদ্ধে দারুণ লড়ছে, এমনটা কেউ কেউ মনে করছেন। দেখে নিই এই যুদ্ধের প্রধান একটা হাতিয়ারের কথা। হাতিয়ার মানে ভেন্টিলেটরের কথা বলছি। শ্বাসকষ্টের এই রোগে আক্রান্ত সঙ্কটজনক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দিতে পারে এই যন্ত্র। তাছাড়া এটা এমনিতেই অন্যান্য অনেক চিকিৎসায় প্রয়োজন হয়। সরকার বলছে, তাদের কাছে সারা দেশে এই যন্ত্র আছে ৮০০০-এর কিছু বেশি। আর বেসরকারি হাতে ৩২০০০ মতো। সব মিলিয়ে ৪০০০০। বাকি কথায় যাওয়ার আগে শুধু একবার খেয়াল করুন, এমার্জেন্সি কেসগুলিতে কেন সরকারি হাসপাতালের চেয়ে বেসরকারি নার্সিংহোমে বেশি যেতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকে। সরকারের হাতে যখন ৮০০০, বেসরকারি হাতে তখন ৩২০০০। যাইহোক, মূল প্রসঙ্গে ফেরার আগে আরেকটা ছোট্ট তথ্য দিয়ে যাই। মুম্বাই হল সেই শহর যেখানে সবচেয়ে বেশি ভেন্টিলেটর আছে। প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ এর কাছাকাছি। যারা পরিষ্কার মনের মানুষ তারা অবশ্য ভেবে বসতে পারেন, মুম্বাইয়েই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন কঠিন অসুখ হয়। না, উত্তরটা আসলে তা নয়। বড়লোকের শহর, বড়লোকের জীবনের দাম বেশি, তাই।

যাইহোক। এই ৪০০০০ ভেন্টিলেটর নিয়ে ভারত নেমে পড়েছে করোনা-যুদ্ধে। John Hopkins University-র গবেষণা বলছে ভারতে যদি কোনও কারণে ইতালির মত অবস্থা হয়, তাহলে ভেন্টিলেটর লাগবে প্রায় ১০ লাখ। আশা করি তেমনটা ঘটবে না, কম ভেন্টিলেটরেই কাজ চলবে। কিন্তু কত কম? ১০ লাখের থেকে কত কম হলেও সামলানো যাবে? যাইহোক, সরকার শুরু করেছে মার্চের শেষদিক থেকে ভেন্টিলেটর যোগাড় করা। কার কাছ থেকে জানেন? চিন। যারা করোনার পেছনে চিনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা দেখেন তারা এই তথ্যকে কীভাবে দেখবেন, জানি না। যাইহোক, দেরীতে হলেও দৌড়তে শুরু করেছে ভারত। এটা ভালো। তবে কতটা পেছন থেকে দৌড়োতে শুরু করেছে সেটা দেখে নেওয়া যাক। এমনিতে ভারত স্বাস্থ্যখাতে খরচের ব্যাপারে বেশ হিসেবি। যেখানে এক লাখ টাকা জাতীয় আয় হলে আমেরিকা স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে ১৮ হাজার, UK ৯৮০০, ব্রাজিল ৯৫০০, এমনকি পাকিস্তান ২৯০০, সেখানে ভারত করে ১৩০০ টাকার কিছু কম। এখান থেকে দৌড় শুরু করেছে ভারত। তারমধ্যে করোনার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বাড়তি খরচ করছে নানা দেশ। এমনিতেই স্বাস্থ্যে পিছিয়ে থাকা ভারত করোনা সামলাতে কতটা বিশেষভাবে দৌড় শুরু করল দেখে নিই। নিশ্চয়ই আপনি ভাবছেন, যেহেতু ভারত এমনিতেই পিছিয়ে তাই এই পরিস্থিতি মেকাপ করার জন্য বাকি দেশগুলোর তুলনায় বেশি খরচ করবে। দেখা যাক তা হয়েছে কিনা। এক লাখ টাকা জাতীয় আয়ে আমেরিকা বিশেষ রিলিফ প্যাক দিয়েছে ১০ হাজার টাকা, UK ১৫ হাজার, পাকিস্তান ৫০০০, সেখানে ভারত দিয়েছে ৮০০। আগেই বলেছিলাম,

ভারত কিন্তু বেশ হিসেবি। তাই এমনি খরচেও হিসেবি, বিশেষ পরিস্থিতিতেও হিসেবি। এভাবেই করোনার লড়াইয়ে ভীষণ শক্তিতে লড়ছি আমরা। আর এসব তথ্য যাতে আপনাকে বিরক্ত না করে তাই একটা মিডিয়া RNA বলে জনপ্রিয় প্রোগ্রামে ভারতবাসীর জন্য লড়াইয়ের একটা স্লোগান বের করেছে, "দো রোটি কম খায়েঙ্গে, করোনা কো ভাগায়েঙ্গে।" মানে বুঝলেন? এখন থেকেই প্রচার চলছে, একটু বেশি কষ্ট করব, একটু বেশি মরব, কিন্তু লড়ব। এই মনোভাবে জনগণকে তৈরী করা শুরু হয়ে গেল। শুধু একটা কথা ভাবতে বলব, ধরুন যৌথ পরিবারে আপনার আত্মীয় অসুস্থ। চিকিৎসার টাকা লাগবে। আপনাকে সবাই বলছে টাকা দিতে কিন্তু ধরুন আপনি ঠিক করেছেন দেবেন না। আবার পরিবারের কাছে ছোটও হতে চান না। কী করবেন এই পরিস্থিতিতে? দুটো কাজ করতে পারেন। প্রথম কাজ, চিকিৎসায় খরচ না করে এমনি খুব চিন্তিত মুখে দৌড়োদৌড়ি করা। জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া যাতে রোগী বেঁচে গেলে খরচা না করেও ক্রেডিট আপনার হয়। আর দ্বিতীয় কাজ, যদি রোগী মারা যায় তাহলে কার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন সেই প্ল্যান এখনই রেডি রাখা। যাতে দোষ আপনার ঘাড়ে এসে না পড়ে। চারপাশটা দেখুন, তেমনটাই হচ্ছে না কি?

নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশনের সময় যেমন টানা ঝিরঝির ঝিরঝির ক্লান্তিকর বৃষ্টি পড়ে, তেমনই বেশ কিছুদিন ধরে দেখবেন অর্থনৈতিক মন্দা বা সঙ্কট নিয়ে ঝিরঝির ঝিরঝির করে নানা কথা ঝরে পড়ছে ওপর থেকে। ওপর মানে IMF (International Monetary Fund), World Bank, অর্থনীতিবিদ, মিডিয়া। পড়ছে আমাদের কানে, গায়ে, মনে। আমাদের মানে, ছাত্র-যুব, দিনমজুর, সেলস ম্যানেজার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ছোট দোকানদার, খেটে খাওয়া মানুষদের উপর। তা বৃষ্টি তো ঝরে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু ওপর থেকে অর্থনৈতিক মন্দা বা সঙ্কট নিয়ে এত গল্পগাছা আসছে কোন নিয়মে? কোন উদ্দেশ্যে? কোন কারণে আমাদের কানে ঝরানো হচ্ছে প্রতিদিন? দেখুন, আমি-আপনি অর্থনীতি নিয়ে সবাই পড়াশোনা করিনি তাই এতকিছু বুঝি না। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট না বুঝে তো চলছেও না। খুব কঠিন ভাষায়, ওরা যাই বলুক না কেন, লাইফ কা মামলা সামাঝনে কি কৌসিস্ তো হাম সবহিকো করনা পড়েগা। ফাজলামি ছাড়ুন, সিরিয়াসলি বলছি, মহাশক্তির জাগরণ চাই। সত্যিই চাই। শুধু করোনার বিরুদ্ধে লড়তে নয়, ওদের বলা এইসব কথার অর্থ বুঝতে। প্রথমেই একটা বিষয় ভাবুন তো, করোনায় কী এমন ঘটবে? আমাদের কি হাত-পা চলে যাবে? তা তো না! যেমন ছিল তেমনই থাকবে। আচ্ছা, তাহলে কি কয়লা খনিতে হঠাৎ করে বালি পাওয়া যাবে? তা তো না। প্রকৃতি তো আর রাজনৈতিক নেতা নয় যে বেইমানি করবে। কয়লাখনিতে কয়লাই থাকবে। মা ধরিত্রী কি চাল-ডাল-গম এসব কম ফলাবে? না, মা তো যা দেয় তাই দেবে। হয়তো একটু বেশিই দিতে পারে চাইলে। তাহলে করোনায় কী এমন চেঞ্জ হবে যা নিয়ে ঝিরঝির ঝিরঝির আতঙ্কের কথা বলা হচ্ছে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, জমি চাষ করার হাতও থাকবে আর খাওয়ার জন্য পেটও থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়ার ইচ্ছেও থাকবে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়ানোর ইচ্ছেও থাকবে। পোষাক কারখানায় শ্রমিকও থাকবে, গায়ে জামা দেওয়ার লোকও থাকবে। আর এই সবকিছুই তো হবে প্রকৃতি মায়ের বুকে। সে তো কষ্ট হলেও আমাদের জন্য হাত উজাড় করে দিয়েছে। সঙ্কটটা তাহলে কোথায়? কারা বলছে? কেন বলছে? কী তাদের উদ্দেশ্য? তারা কি অর্থনীতি বলতে মা ধরিত্রী, শ্রম, খিদে, দেওয়া-

নেওয়া ছাড়া আরও কিছু বলতে চায়? আমার চোখে তো অর্থনীতি মানে শ্রম, উৎপাদন আর তার বিনিময়। করোনায় এসব তো কিছুই বদলাবে না। তবে? আমার এসব কথা শুনে চশমা চোখে ভারী গলায় ইংরেজিতে কেউ আমাকে বলতে পারেন, "অর্থনীতির মত একটা কঠিন বিষয়, তার আলোচনায় এইসব বোকা বোকা কথা আর বোকা বোকা প্রশ্নের মানে কী?" উত্তরে আমি বলব, জটিল পদার্থবিদ্যার অধ্যায় শুরু হয় এই বোকা বোকা প্রশ্ন দিয়ে, "আপেল আকাশে উড়ে না গিয়ে মাটিতেই কেন পড়ল?" তাই বন্ধুরা, কেউ ভয় পাবেন না। ওরা অর্থনীতির ভাষাকে জটিল করেছে ওদের স্বার্থে, ওদের কু-মতলবে। আমরা নিউটনের মতই একটা বোকা প্রশ্ন তুলতে চাই।

এবারে দেখে নেব অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে ওপরতলার লোকজনের বলা কিছু কথা। IMF পৃথিবীর এক বড় মাতব্বর সংস্থা। তাদের এক ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছেন,
"We anticipate the worst economic fallout since the great depression." সোজা বাংলায় যার মানে হল, গত ১০০ বছরের সবথেকে খারাপ অর্থনৈতিক সঙ্কট আসতে চলেছে। অন্য একটা সংস্থা, ILO, International Labour Organization, তার রিপোর্টে বলছে, প্রায় ৪০ কোটি মানুষ তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হবেন। বাংলায় বললে, বেঁচে থাকতেই সমস্যায় পড়বেন। কথাগুলো শুনলে মনে হবে, এগুলোই যেন প্রকৃতির নিয়ম। আপন নিয়মেই হবে। কিন্তু তা নয়। অনেকে বলছেন, সঙ্কট তো আসবেই, কারণ মানুষের হাতে টাকা নেই। লোকে কেনাকাটা না করলে কারখানা ব্যবসা চলবে কী করে! লোকে চাকরি পাবেই বা কী করে? উল্টো করেও প্রশ্নটা করতে পারেন, কলকারখানা-পরিষেবা এসব না চললে লোকজনের জীবিকার কী হবে? আর জীবিকা না থাকলে লোকের হাতে টাকা থাকবে কী করে? কথাটা শুনে আমাদের ভারী আশ্চর্য লাগে। সরকারও বলে টাকা নেই, মানুষের হাতেও টাকা নেই, তো সব টাকা গেল কোথায়? এর উত্তর পাওয়া যায় যেসব তথ্য থেকে, তার কিছু আমরা আগেও দিয়েছি। এখানে ফের উল্লেখ করি। অক্সফ্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ভারতে মোট যা জাতীয় সম্পদ তৈরী হয়েছে, তার ৭৩% মাত্র ১% এর হাতে জড়ো হয়েছে। আরেকটা তথ্য হল, ভারতে বড়লোক ৬৩ জনের সম্পদ সরকারের বাজেটের থেকেও বেশি! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, টাকা গেল কোথায়। এমন মুনাফা করেছে কিছু জন যে আজ বাজারে কেনবার লোক নেই। আজকে তারাই আবার বাজারে কেনবার লোক নেই এই যুক্তি দেখিয়ে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার গালভরা নাম দিয়েছে 'অর্থনৈতিক সঙ্কট'। কারণ ছাঁটাই বললে গন্ডগোল পাকার সম্ভাবনা থাকে, সরকারের উপরও কিছু দায় বর্তায়। সরকার তো ওই ৬৩ জনের বন্ধু। আর বন্ধু না হয়ে উপায়ও নেই, কারণ দ্বিতীয় তথ্যটা (বাজেট নিয়ে) মনে আছে তো? তাই জনগণের দায়িত্ব নেবে না বলে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারাও এই গালভরা নামটা দিয়েছে। জটিল লাগলে চলুন আর একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা বোঝা যাক।

ধরুন, এক গ্রামে এক সুদখোর মহাজন আছে। এমন চড়া সুদ নিয়ে সে ব্যবসা করত যে কেউই বন্ধক রাখা জিনিস ফেরত নিয়ে যেতে পারত না। এটা কিছুদিন চলতে থাকলে কী হবে? দ্রুত গ্রামের লোকের কাছে বন্ধক রাখার মত জিনিসই কমে আসবে। তখন সুদের ব্যবসাতেও একটা সংকট দেখা দেবে। মহাজন তখন "ব্যবসার হাল খুব খারাপ গো, অর্থনৈতিক সঙ্কট

চলছে গো" বলে আরো চড়া সুদের রাস্তা সমাধান হিসেবে হাজির করবে গ্রামে। আজকের এই অর্থনৈতিক সঙ্কট এই গল্পটার সাথেই মেলে না কি? স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অনুমান, এই অর্থনৈতিক সঙ্কট, করোনা সঙ্কট, ইত্যাদিকে অজুহাত করে ছাঁটাই, আরো কম মাইনেতে কাজ, ৮ ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা কাজ, ওভারটাইম না দেওয়া, সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেওয়া, এইসবের প্রস্তাব শিগগিরই আসতে শুরু করবে ওই ৬৩টি শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। আর আমাদের সরকার বাহাদুর সেগুলোকেই সাহায্য করবে শ্রম আইন বদলে দিয়ে। এরপরও যদি পাবলিক ঝামেলা করে, মিডিয়া তো আছেই। নানা মিথ্যা ও অশ্লীল তথ্যের প্রচার চালিয়ে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। কেউ বলতে পারেন, ৬৩টি শিল্পগোষ্ঠী নিয়েই বারবার এত কথা কেন বলছি? কারণ, এদের হাতেই ভারতবর্ষের বেশিরভাগ কলকারখানা, জমি, ব্যবসা। সরকার কটা লোককে চাকরি দেয়? আমরা বেশিরভাগ জন কাজ করি এই শিল্পগোষ্ঠীদেরই নানা শাখা-প্রশাখায়। এরা মজুরি না দিলে বাজারে টাকা থাকবে কোথা থেকে? ছোট দোকান, রেস্তোরাঁ, সার্ভিস সেক্টর, এগুলোই বা চলবে কী করে? তাই সরকারের উচিত সঙ্কটের গান না গেয়ে এই গোষ্ঠীদের বাধ্য করা যাতে তারা ছাঁটাই না করে, বেতন যাতে না কমে, শ্রমঘন্টা যাতে না বাড়ে, এইগুলো দেখা। আর আমাদের উচিত, এইসব নির্দেশ মানতে তাদের বাধ্য করা। একটা ছোটবেলার গল্প বলি।

পাড়ার ৬-৭ জন আমরা হাজির মাঠে। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। হঠাৎ ঝামেলায় খেলাটা ভেস্তে গেল। কারণ, যার ব্যাট-বল তাকে আউট দেওয়ায় সে মানতে নারাজ। আউট দিলে সে আর খেলবে না। এই বলে ব্যাট-বল নিয়ে বাড়ি চলে গেল। এটা মাঝেমাঝেই ঘটত। এমন অভিজ্ঞতা বোধহয় আপনাদের জীবনেও হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, ক্রিকেট খেলার জন্য যেমন আমাদের ব্যাট-বল লাগে, তেমনই যার ব্যাট-বল তারও তো খেলার জন্য আমাদেরকে লাগে। কিন্তু কোনওদিন শুনিনি, যার ব্যাট-বল তাকে আমরা ব্ল্যাকমেইল করেছি এই বলে যে, আউট মেনে নে নাহলে আমরা তোর সাথে খেলব না। সবসময় উল্টো ব্ল্যাকমেইলটা ওই আমাদের সাথে করত, যে, আউট দিলে ব্যাট-বল নিয়ে বাড়ি চলে যাব। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অর্থনৈতিক সঙ্কটের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা যে শুধু সাধারণ মানুষেরই সমস্যা তা তো নয়! ওই ৬৩ জন শিল্পগোষ্ঠীরও তো ব্যবসা আটকে যায় এতে। ওরা নিশ্চয়ই চাইবে না ওদের ব্যবসা আটকে থাক। তাহলে ওরা এটা কেন করবে? এই প্রশ্নটারই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমাদের ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার গল্পটার মধ্য দিয়ে। আর এও ঠিক, ছোটবেলায় যা করতে পারিনি সবাই মিলে এখন তা করবার সময় এসেছে।

করোনা সংক্রমণ রুখতে যে যাই রাস্তা নিক না কেন, বা রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজাক না কেন, এর মূল সমাধান ভ্যাকসিন আবিষ্কার। করোনা সংক্রমণের প্রথম ঘটনাটা ঘটে গতবছর (২০১৯) পয়লা ডিসেম্বর চিনের ইউহান শহরে। চিনে সংক্রমণের গতি তীব্র হয়ে ওঠে ডিসেম্বরের শেষের দিকে। চিন এই ভাইরাসের জেনেটিক্স তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানায় ১২ই জানুয়ারী। ভাইরাসের জেনেটিক্স তথ্য মানে সহজ কথায় বলতে পারেন ভাইরাসটার নাড়ি-নক্ষত্র বা ঠিকুজি-কুষ্ঠি। এই ভাইরাস আকারে কেমন, তা কীভাবে কাজ করে, এইসব তথ্য সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের কাছে পৌঁছয় ১২ই জানুয়ারী। নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও আমরা ধরে নিতে পারি, তার পর থেকেই করোনার প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা শুরু হয়ে

যায়। তখন যদিও করোনা প্যান্ডেমিকের উপাধি পায়নি। কারণ তখনও পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা-সহ বিশ্বের আর কোথাও সংক্রমণের কোনও খবর ছিল না। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমেরিকায় প্রথম সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় ২০শে জানুয়ারী, ইউরোপে পাওয়া যায় ২৪শে জানুয়ারী। গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১০০টি প্রতিষ্ঠানে গবেষকরা খেটে চলেছেন প্রতিষেধকের খোঁজে। এর মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৭৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। বিজ্ঞানী মহল যখন পরিশ্রম করে চলেছে প্রতিষেধক আবিষ্কারে সেই সময় করোনাও তার সংক্রমণের গতি বাড়িয়ে চলছে পৃথিবীতে। ১২ই জানুয়ারী যেখানে সংক্রমণের সংখ্যা পাঁচশোরও কম ছিল, ১১ই মার্চে এসে দেখা যাবে সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার জনে। ১১ই মার্চই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা সংক্রমণকে প্যান্ডেমিক বা অতিমারী বলে ঘোষণা করে। বিজ্ঞানীরাও থেমে নেই, প্যান্ডেমিক ঘোষণার ঠিক পাঁচদিনের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৬ই মার্চ প্রথম মানবদেহে করোনা প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়। এটা শুরু হয় আমেরিকার সিয়াটেল শহরে মডার্না নামক এক সংস্থার অধীনে। এই সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ৪৫ জন মানুষের শরীরে প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করে। ১৬ই মার্চ প্রতিষেধকের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়ে গেলেও তখনও বিশ্বজুড়ে লকডাউনের তোড়জোড় শুরু হয়নি।

প্রসঙ্গত আপনাদের জানিয়ে রাখি, যেকোনও ভ্যাকসিনই মানুষের শরীরে তিনটে পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফল পেলে তবেই বাজারে আসে। বলা বাহুল্য, মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের আগে সেটা পরীক্ষা করা হয় পশুদের শরীরে। সেই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পেলে তারপরেই মানব শরীরে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করা হয়। মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে শারীরিকভাবে সবল অল্পসংখ্যক মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়। এর পরের পর্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে একটু বেশি সংখ্যক মানুষের উপর পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে এমন কিছু জন মানুষও থাকেন, যাদের সংক্রমণের সম্ভাবনাও আছে। আর তৃতীয় পর্যায়ে বেশি সংখ্যক মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয় যাতে নানা ধরনের শারীরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা সম্পন্ন মানুষ থাকেন। এই তিন পর্যায়ে পরীক্ষা হয়ে গেলে তারপর সেটা পাঠানো হয় সরকারি অনুমোদনকারী সংস্থার কাছে। তারপর অনুমোদনকারী সংস্থা অনুমোদন দিলে তা বাজারে আসতে পারে। আপাতত বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা মানবদেহে পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে আছেন। বিশ্বে এখনও পর্যন্ত ৬টি সংস্থা মানবদেহে প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে। তবে বাকি দুই পর্যায়ে সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হলে তবেই এই ভ্যাকসিন বাজারে আসতে পারবে। এই ৬টি সংস্থার মধ্যে রয়েছে, আমেরিকার দুটো, চিনের তিনটে এবং ইংল্যান্ডের একটা। এমনিতেই প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করার জন্য প্রায় ১২-১৩ মাস সময় নেওয়া হয়। সমস্ত পর্যায়ে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হলে ভ্যাকসিন বাজারে আসতে সময় লেগে যায় প্রায় কয়েক বছর। প্রয়োজনীয় সময় না দিয়ে গবেষণা করলে সেক্ষেত্রে নানাধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এখনও অবধি মোটামুটি যা জানা যায়, ভ্যাকসিন গবেষণায় সাফল্যের হার ৬%, অর্থাৎ ১০০টি

পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৬টি ক্ষেত্রে তা চূড়ান্ত সফলতা পায়। এতকিছু অনিশ্চয়তার পরেও আশার কথা এটাই যে করোনা সংক্রমণের গতির সাথে তাল মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছেন বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা।

আমেরিকার সিয়াটেলের পাশাপাশি চিনে ৯৬ জনের উপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে মার্চের মাঝামাঝি। আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ, প্রায় ৮০০ জনের উপর প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু করেছে ২৪শে এপ্রিল থেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয় একজন মহিলার শরীরে ভ্যাকসিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সংস্থার গবেষণার ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়েছে। এই কথা আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ, এর আগে আমরা বলেছিলাম, নানা ওষুধ ও ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের প্রথম দুই পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঐতিহাসিকভাবে খুবই কম থেকে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ই না, তার ফলে বাজারে আসা ওষুধ ও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মহিলাদের শরীরে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং অনেকসময় সে ভ্যাকসিন কাজই করে না।

ভারতবর্ষেও কিছু প্রতিষ্ঠান করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণার কাজ করছে। শুধু মানুষ নয়, বিশ্বের নানান জায়গায় পশুদের ক্ষেত্রেও করোনার সংক্রমণের কথা শোনা যাচ্ছে। বেলজিয়ামে একটা ও আমেরিকায় দুটো বিড়ালের শরীরে, সিঙ্গাপুর ও জাপানে দুটো কুকুরের শরীরে করোনা সংক্রমণের কথা শোনা গিয়েছে। করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে শুধু মানুষ নয়, পশুদের ক্ষেত্রেও তা হবে এক বড় আবিষ্কার।

করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়ে গেলেও কেনার মত টাকা না থাকায় অনেকে তা পাবেন না, এরকম সম্ভাবনাও রয়েছে। এর আগে HIV-র ওষুধের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব এমনটা ঘটেছে। তাই আমাদের সকলকে নজর রাখতে হবে, এইরকম ঘটনা করোনার ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যাতে না হয়।

ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলো পরিকাঠামোর অভাবে নানা অসুবিধায় পড়লেও করোনার ক্ষেত্রে সেই অনুন্নয়নই খানিক সুবিধাজনক অবস্থায় রেখে দিয়ে গেল তাদের। গত এক-দুই দশকে চিন হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর কারখানা। পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের ২৮% তৈরী করে চিন ছিল শীর্ষস্থানে। স্বভাবতই আমেরিকা ও ইউরোপের ধনী দেশগুলোর চিনের সাথে যাতায়াতও এই কয়েক দশকে বেড়েছে মারাত্মকভাবে। একটা তথ্য দিলে বুঝতে পারবেন, ভারত আর চিনের মধ্যে ননস্টপ ফ্লাইটের সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে যেখানে ৪টি, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে সেই সংখ্যা ৬১টি। ইউরোপের উন্নত দেশগুলো ও চিনের মধ্যে ফ্লাইটের সংখ্যা একশোরও বেশি। তাই করোনার সংক্রমণের একটা গতিশীল মানচিত্র যদি আপনি বানান তাহলে দেখবেন, তা প্রথমে ছড়িয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। বিমান যাতায়াতই সংক্রমণের মূল রাস্তা বলে সংক্রমণ আটকানোর ক্ষেত্রে ফ্লাইট নিয়ে সরকারের নীতি কী হচ্ছে, তা চর্চায় আসা জরুরি, এক্ষেত্রে এসেওছে। ছোঁয়াচে কোনও রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত গরীব মানুষেরই অবদান বেশি থাকে। কিন্তু এই রোগের বিশ্বভ্রমণের ক্ষেত্রে অবদান বিমানে যাতায়াত করা বড়লোকদের সবথেকে বেশি। এক্ষেত্রে বড়লোকেরাই সংক্রমণের বাহক হওয়ায় সরকারের প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণে অসুবিধা হয়েছে বলে অনেকের

নিশ্চিত ধারণা। গরীব লোকেরাই মূলত বাহক হলে তাদের প্রতি কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নানা দেশের সরকার হয়তো করোনার বিশ্বভ্রমণের পরিকল্পনা শুরুতেই আটকে দিত।

যে কথায় ছিলাম। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো হয়তো অনুন্নয়নের কারণেই করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় খানিকটা বাড়তি সময় হাতে পেয়েছে নিজেদের সামলে নেওয়ার জন্য। প্রশ্ন তাই দুটো। এক, সেই সুযোগের কতটা সদ্ব্যবহার করেছে আমাদের দেশ ভারত? দুই, যদি ভবিষ্যতে এমনই কোনও সংক্রমণ প্রথম ধাক্কায় আমাদের দেশে এসে পড়ে, তার মোকাবিলার জন্য কতটা তৈরী আমরা? প্রথমে ফ্লাইটের প্রসঙ্গে আসি। ভারত চিনের সঙ্গে বিমান যাতায়াত বন্ধ করেছিল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। চিন করোনার উৎসস্থল, তাই প্রথম তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করাটাই স্বাভাবিক। ৪ঠা মার্চ ভারত সরকার চিন সহ জাপান, হংকং, নেপাল, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, এই দেশগুলোর থেকে বিমানে আসা যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেয়। খেয়াল করে দেখুন, দেশের তালিকায় ইউরোপ বা আমেরিকা কিন্তু নেই। যদিও ইউরোপ, আমেরিকায় সংক্রমণের খবর ততক্ষণে সরকারের কাছে ছিল। তথ্যের দরকার নেই, অনুমান করলেও ভারত সরকার বুঝতে পারত চিনের থেকে সংক্রমণ ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে ঢোকার সম্ভাবনাই প্রবল, নেপালের থেকে নয়। এরপর ২২শে মার্চ অর্থাৎ অতিমারী ঘোষিত হওয়ার ১১ দিন পরে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বাতিল করে ভারত সরকার। এই সময়-পর্যায়ে যতজন বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁদের সরকারি বন্দোবস্তে কোয়ারেন্টিন কেন করা হল না সেই প্রশ্নের উত্তর সরকার এখনও দেয়নি। করোনা মোকাবিলায় সফল হংকং, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, এই দেশগুলি ওইটা করেই নিজেদের দেশে সফলভাবে করোনা আটকাতে পেরেছিল। এককথায় বলা যায়, ইউরোপ-আমেরিকার থেকে বাড়তি সময় পেলেও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ভারত করতে পারেনি, যা করলে হয়তো ভারতের মানুষকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হত না। পাশাপাশি, করোনা মোকাবিলার নামে বিনা পরিকল্পনায় দেশজোড়া লকডাউন ঘোষণা করার কেমন সুফল পাচ্ছে ভারত তা আজ চোখের সামনে স্পষ্ট।

ভবিষ্যতে কোনও সংক্রমণের উৎসস্থল যদি ভারত হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কতটা তৈরী সেই প্রশ্নে আসা যাক। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারত ১০২ নম্বরে। যে দেশ খাদ্যের প্রশ্নে এত পিছিয়ে তার অধিবাসীদের সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সিস্টেম যে দুর্বল হবে তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। খালি পেটে যোগব্যায়াম, গোমূত্র এসব কাজ করে কি না তা আমাদের জানা নেই। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বা চিকিৎসা করাতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত হওয়ার ঘটনা এদেশে নিত্তনৈমিত্তিক। বায়ুদূষণ, দূষিত জল পান, হাসপাতালে বেডের অভাব, ডাক্তারের অভাব, এসব মিলিয়ে স্বাস্থ্যের একটা বেহাল ছবি আমরা দেখতে পাই। এক কথায় বলা যায়, মানুষ এখানে যতদিন বাঁচে তা যত না চিকিৎসার সাহায্যে, তার থেকে বেশি চিকিৎসা ছাড়াই, নিজের জোরে, প্রকৃতির জোরে।

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই বছরের ৫ই মার্চ দেশের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সংস্থা ICMR (Indian Council of Medical Research) বলে, একমাত্র অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং করেই করোনার এই সংক্রমণ রুখতে পারা সম্ভব। কিন্তু সেই টেস্টের ক্ষেত্রে কতটা এগোনো গেল, তা একবার দেখে

নেব। ২৬শে এপ্রিল অবধি ভারতে টেস্টের সংখ্যা প্রতি লাখে ৫০-এর কিছু কম। সেটা ঠিক কতটা কম বা বেশি বুঝতে পারবেন অন্যান্য দেশের সাথে তথ্যটাকে তুলনা করলে। জার্মানিতে এই টেস্টের সংখ্যা প্রতি লাখে ২৪০০, আমেরিকায় প্রতি লাখে ১৬০০, এমনকি পাকিস্তানেও সেই সংখ্যা প্রতি লাখে ৬০-এর একটু বেশি। এককথায় বলা যায়, ICMR প্রস্তাবিত অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে ভারত খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে।

লকডাউন তুলে যদি করোনা মোকাবিলা করতে হয় তাহলে এই টেস্টিং কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাবে বলে অনেকের অভিমত। ৩রা এপ্রিলে এসে ভারত সরকার হটস্পট জোনগুলোয় সিম্পটম না থাকলেও ব্যান্ডম টেস্টিং, অর্থাৎ অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ICMR-এর প্রস্তাব ৫ই মার্চে এলেও কেন অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং-এর ব্যাপারে এত দেরী, তাও শুধু হটস্পট চিহ্নিত জায়গার ক্ষেত্রেই কেন তা করা হচ্ছে, তার কোনও সদুত্তর সরকারের থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ২১শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানায় ICMR যে টেস্টিং কিটগুলো পাঠিয়েছে সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ। এমনকি রাজস্থানও ICMR-এর টেস্ট কিটগুলোর অ্যাকিউরেসি মাত্র ৫% হওয়ায় সেগুলো দিয়ে টেস্ট করা বন্ধ করে দেয়। ICMR নিজেও তার পাঠানো টেস্টিং কিট সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। ভারত সরকারের ইনভেস্টমেন্ট এজেন্সি 'ইনভেস্ট ইন্ডিয়া' ২৭শে মার্চ তাদের রিপোর্টে জানায় করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এসেন্সিয়াল সার্ভিস, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, এদের জন্য প্রায় ৫ কোটি মাস্ক ও ৬২ লাখ PPE কিট লাগবে। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের ২০শে এপ্রিলে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে এখনো পর্যন্ত মাত্র ২৬ লক্ষ মাস্ক এবং ৮ লক্ষ PPE কিট রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাস্ক ও PPE কিট না থাকা এত প্রয়োজনীয় পরিষেবার সাথে যুক্ত মানুষদের যে বিপদে ফেলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যদি ডাক্তার, বেড, ভেন্টিলেটর প্রভৃতি পরিষেবা পাওয়ার কথা বিচার করেন তাহলে তো উন্নত দেশগুলোর কথা ছেড়েই দিন, প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার থেকেও আমাদের দেশের হাল খারাপ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ভারতের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ হাজার জনপিছু ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ৮। সেখানে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় প্রতি ১০ হাজার জনপিছু ডাক্তার রয়েছে ১০ জন মতো। কোন ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসবাদী হামলা বা আতঙ্কবাদের ফলে যে ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার এই বেহাল দশা হল তা দেশের প্রধানমন্ত্রীই জানেন। এরপরেও ভারতের স্বাস্থ্যখাতে অস্বাভাবিক কম খরচের ঐতিহ্য তারা সগর্বে চালিয়ে যাচ্ছে।

করোনার এই ধাক্কা আমাদের দেশের তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে আমরা কতটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তারই একটা নমুনা দেখিয়ে দিয়ে যায়। ভারতে সবথেকে বেশি করোনা আক্রান্ত শহর মুম্বাই। এই মুম্বাইয়ের ধারাভি বস্তিতে এখনও পর্যন্ত ২০০ জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাই নিয়মানুযায়ী ধারাভি বস্তিতে থাকা প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করার কথা সরকারের। কিন্তু সেখানে মহারাষ্ট্র সরকার মাত্র ২৩০০ জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। তার ফলে বোঝাই যাচ্ছে ধারাভি বস্তিতে থাকা ১০ লক্ষ মানুষের ব্যবস্থা করতে সরকার একপ্রকার অক্ষম।

করোনা ভাইরাস অতি সংক্রমণশীল হলেও এর মারণ ক্ষমতা ২-৩% এর মধ্যে, এমনটাই ধারণা ছিল সকলের। স্বাস্থ্য পরিষেবা-

পরিকাঠামো যেসব দেশে উন্নত, যেসব দেশের অর্থনৈতিক শক্তি অনেক বেশি, তারা করোনার ধাক্কা বাকিদের তুলনায় অনেক ভালো সামলাবে এমন ধারণাও ছিল সকলের। বাস্তব কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার উল্টো ছবিটাই হাজির করেছে। করোনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী দেশ বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, বেহাল অবস্থা ইউরোপের উন্নত দেশগুলোরও। উন্নত প্রথম বিশ্বের এই বেহাল অবস্থার কারণ কী তা নিয়ে সার্বিক কোনও ব্যাখ্যা হাজির না হলেও কিছু কিছু তথ্য সামনে উঠে এসেছে। করোনা সংক্রমণের বিপদকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়াই একটা বড় কারণ বলে প্রাথমিক ধারণা করছেন অনেকেই। চিন তথ্য দিতে দেরি করুক বা না করুক, তথ্য পাওয়ার পরেও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে কেন এত দেরী করল এই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। চলুন অভিযোগগুলো একটু খুঁটিয়ে জেনে নিই। ১২ই জানুয়ারি চিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে করোনা ভাইরাসের জেনেটিক্স পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। যদিও তার আগেই ৩রা জানুয়ারি চিনের স্বাস্থ্য দপ্তর আমেরিকার স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরকে ফোন করে করোনা সংক্রমণের বিপদের কথা জানায়। আমেরিকার স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর ট্রাম্পকে সে কথা জানিয়ে চিঠি দেন। জানা যাচ্ছে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাই জানুয়ারির শুরুর দিক থেকে এই আসন্ন বিপদ সংক্রমণ সম্পর্কে ট্রাম্পকে সতর্ক করেছিল। ট্রাম্পের চিফ অ্যাডভাইজার ট্রাম্পকে একটা আর্জেন্ট মেমো পাঠান ২৮শে জানুয়ারি। চিনের স্বাস্থ্য দপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, নিজের দেশের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা, নিজের দেশের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, নিজের মুখ্য উপদেষ্টার থেকে বারবার সতর্কবার্তা জানুয়ারি মাসের শুরুর থেকে পাওয়া গেলেও কেন ট্রাম্প কোনও ব্যবস্থা নেননি এই প্রশ্ন তুলেছে পশ্চিমী মিডিয়ার একটা বড় অংশ। স্বভাবতই, চিনের উপর তথ্য গোপন বা দেরীতে তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তুলে ট্রাম্প নিজের ভুলকেই ঢাকতে চাইছেন, চিনের ঘাড়ে দোষ দিয়ে নিজেকে সাফসুতরো করতে চাইছেন বলে অভিযোগ তুলছেন এই সাংবাদিকরা। তাঁদের আরও নির্দিষ্ট প্রশ্ন হল, চিন যদি দেরীতে তথ্য দিয়েও থাকে, তথ্য পাওয়ার পর ট্রাম্পের পদক্ষেপ নিতে এত দেরী কেন? একইভাবে ইতালি সরকারকেও দেখা যাবে অনেক দেরীতে পদক্ষেপ নিতে। ইংল্যান্ডকে দেখব লকডাউনের রাস্তা নেবে, না কি করোনা সংক্রমণকে বাড়তে দিয়ে হার্ড-ইমিউনিটি গড়ে তোলার রাস্তা নেবে, এই দোলাচলে পড়ে পদক্ষেপ নিতে দেরী করছে। স্পেন, ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অনেকের মতে ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখতে, শেয়ারবাজার সক্রিয় রাখতে গিয়ে প্রত্যেকটি সরকারই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আপনাদের খেয়াল করাতে চাইব, আক্রান্ত দেশগুলোর অবস্থা দেখে বিপদের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ভারতের কাছে থাকলেও তার সদ্ব্যবহার ভারত সরকার করেনি, এমনটাই অনেকের মত। ফ্লাইট বন্ধ এবং ফ্লাইটে ফেরা যাত্রীদের আগেভাগে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলে ভারতকে দেশজোড়া লকডাউনের কঠিন পরিস্থিতিতে যেতে হত না, এমনটাই অনেকে মনে করছেন। তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ তেমন কথাই বলে। এরপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সংক্রমণ যদি বেড়েও থাকে তাহলেও প্রথম বিশ্বের দেশগুলোয় মৃত্যুর হার এত চোখে পড়ার মত বেশি কেন? এই দেশগুলোর

উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনও প্রভাবই কেন চোখে পড়ল না? এজন্য এই দেশগুলোর স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সরকারি নীতিকে দায়ী করছেন অনেকে। কোথাও চিকিৎসার অস্বাভাবিক খরচ, কোথাও বাজেটে ঘাটতি, কোথাও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক বেসরকারিকরণ, এগুলোই বিপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা না করতে পারার কারণ হিসেবে খবরে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে এখনও অবধি পাওয়া তথ্যগুলোকে আসুন আপনাদের সামনে তুলে ধরি।

'Channel 4 News'-এর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের বাজেট তার আগের থেকে ৮০% কমিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকায় চিকিৎসার খরচ এত বেশি যে আমেরিকার সাধারণ জনগণকে চিকিৎসার জন্য নির্ভর করতে হয় হেলথ ইন্সিওরেন্স বা স্বাস্থ্যবীমার উপর। বীমা ছাড়া ওদেশে চিকিৎসা পাওয়া একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। 'The Economist'-এর তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় ১২% মানুষের হেলথ ইন্সিওরেন্স নেই এবং আরো ২৩% মানুষের ইন্সিওরেন্সের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তার উপর, আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বড় ফারাক দেখা যায়। BBC-র তথ্য বলছে প্রায় ২০% মানুষের ডাক্তার দেখানোর মত সামর্থ্য নেই আমেরিকায়। এর প্রভাব আমরা দেখতে পাব করোনার মৃত্যুর হিসেবের দিকে দেখলে। আমেরিকার শিকাগো শহরে করোনায় মৃতদের মধ্যে ৭২% কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, যেখানে ওই শহরে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। ইউরোপে করোনা বিধ্বস্ত দেশগুলোর দিকে দেখলে দেখা যাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লাগামছাড়া বেসরকারিকরণ করোনা পরিস্থিতি সামলানোর ব্যর্থতার পিছনে একটা বড় কারণ। ইউরোপের প্রথম যে দেশে করোনার প্রভাব সবথেকে বেশি চোখে পড়ে, সেই ইতালিতে স্বাস্থ্যখাতে গত এক দশকে ব্যাপক পরিমাণ সরকারি বাজেট কমানো হয়। তা নিয়ে সে দেশে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও বড় বড় আন্দোলনের খবর পাওয়া যায়। যেখানে ২০১২ সালে ইতালির জিডিপির ৯.২% স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হত, ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় জিডিপির ৬.৬%। গত ১০ বছরে ইতালিতে চিকিৎসার খরচ প্রায় ২২.৪% বেড়ে গেছে। এই ছবিটাই স্পষ্ট করে প্রথম বিশ্বের দেশ হিসেবে এদের অর্থনৈতিক শক্তি ভালো হলেও দেশের সাধারণ গরীব মানুষের কাছে কতটা স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছোয় তা ভেবে দেখার মত একটি বিষয়। করোনার বিপদকে বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপের মধ্যে ব্যতিক্রমী দেশ হিসেবে জার্মানিকে আমরা দেখতে পাব। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে যখন ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো এই সংক্রমণকে পাত্তাই দেয়নি, তখন থেকে জার্মানি করোনার বিষয়ে তৎপর ভূমিকা নেওয়া শুরু করে। ফেব্রুয়ারি থেকেই দেখা যাবে জার্মানি নিজেরাই টেস্ট কিট বানিয়ে ফেলে এবং জার্মান ফুটবলের মত প্রথম থেকেই অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং শুরু করে দেয়। জার্মানিতে টেস্টের সংখ্যা প্রতিবেশী অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। শুধুমাত্র গত সপ্তাহেই জার্মানি প্রায় ৫ লক্ষের উপর টেস্ট করেছে। অপরদিকে আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখা যাবে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টেস্ট করেছে মাত্র ৪২৬ জনের। যদিও আমেরিকায় প্রথম করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে ২০শে জানুয়ারি। মার্চে এসে দেখা যাবে আমেরিকা নানান রাজ্যে টেস্ট কিট পাঠাচ্ছে। তারপরেও দেখা যায় আমেরিকার CDC অর্থাৎ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল যে টেস্ট কিটগুলি নানা রাজ্যে পরীক্ষার জন্য পাঠায় তার মধ্যে অনেকগুলোই ভুল রেজাল্ট দিচ্ছে। তখন জার্মানি ও চিনের টেস্ট

কিট যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ব্যবহার করে, সেগুলো নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা ব্যবহার না করে CDC-র টেস্ট কিটই ব্যবহার করতে হবে, এই নির্দেশ দেয় ট্রাম্প সরকার। জার্মানি বাদে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যাবে তারা টেস্টিং এবং লকডাউনের মতন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনেক দেরী করেছে। প্রথম থেকেই অ্যাগ্রেসিভ টেস্টিং-এর উদাহরণ শুধু জার্মানিতে নয়, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ার মত দেশেও পাওয়া গেছে। তাই অনেকে লকডাউনের থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ টেস্টিং হচ্ছে কি না, সেটাকেই করোনা মোকাবিলায় প্রাথমিক হাতিয়ার বলে মনে করছে। খেয়াল করাবো, এই টেস্টিংয়ে কম জোর দেওয়া নিয়েই ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছে অনেক প্রশ্ন। মৃত্যুর সংখ্যাতত্ত্ব বাড়তি মৃত্যুহারের পিছনে আরো কয়েকটা কারণকে তুলে ধরেছে। সকলেরই এতদিনে জানা যে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে করোনা অনেক বেশি ঘাতক শক্তি ধরে। ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে তাদের বয়স্ক মানুষের সংখ্যাধিক্য মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ বলে ধরা যেতে পারে। ইংল্যান্ডের গড় বয়স প্রায় ৪০ বছর, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তা ৪১, জার্মানির ক্ষেত্রে প্রায় ৪৬, ইটালির ক্ষেত্রে প্রায় ৪৭ বছর। বোঝাই যাচ্ছে এই দেশগুলোর জনসংখ্যার বড় অংশেরই বয়স ৬০ বছরের বেশি। ভারতে এই গড় বয়স প্রায় ২৬ বছর।

বিশ্ব জুড়ে লকডাউন চলায় পেট্রোল, ডিজেলের চাহিদা অনেক কমে গেছে। এখন আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম মোটামুটি ২০ ডলার প্রতি ব্যারেল। যে নতুন নিয়মে আমাদের দেশে পেট্রোল ডিজেলের দাম ঠিক হয়, সেই নিয়ম লাগু করার সময় সরকারের যুক্তি ছিল, দামের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে গেলে গ্রাহকদেরই সুবিধা হবে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়া-কমার সাথে সাথে দেশের বাজারেও তেলের দাম বাড়বে-কমবে। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেক কমে গিয়ে প্রায় ২০ ডলার প্রতি ব্যারেল হলেও দেশে তেলের দাম কমার কোনো লক্ষণই নেই।

সরকারের গুদামে থাকা চালের একটা অংশ ইথাইল অ্যালকোহল তৈরীর কাজে লাগানোর ছাড়পত্র দিল সরকার। সরকারের যুক্তি, স্যানিটাইজারের বাড়তি যোগান মেটাতে এই পদক্ষেপ। যখন দেশে বহু মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, তখন চাল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে অ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহার করার সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জবাবে সরকার জানায়, প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি চাল রয়েছে সরকারি গুদামে। গুদামে বাড়তি চাল থাকার পরও মানুষ কেন অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এ প্রশ্ন থেকেই যাবে। যুক্তি দিয়ে ভাবলে, খাদ্য বাড়তি তখনই হওয়ার কথা যখন দেশের সমস্ত মানুষ পেটভরে উপযুক্ত খাবার পাওয়ার পরেও খাবার পরে থাকে। বাস্তব চিত্র যখন তা নয়, তখন সরকারের এই দাবি হাস্যকর। শুধু হাস্যকর নয়, অমানবিকও বটে।

যার কোনও শেষ নেই

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, ব্যবসা বা রাজনীতি কোনওটাই থেমে থাকে না। করোনা সঙ্কটের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। নিউজ মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াতে এসব নিয়ে বহু খবর চোখে পড়ছে। রাজ্য, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে বহু তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হচ্ছে। সব একরকম না হলেও একটা প্রসঙ্গে সবাই একমত। অর্থনীতি, রাজনীতি, বিদেশনীতি বহু ক্ষেত্রেই কিছু

একটা বদল ঘটতে চলেছে। এসবের বদল যে সমস্ত মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে, একথা বলার প্রয়োজন থাকে না। যে মানুষজন পেটের ভাত জোটাবেন কীভাবে, সেই অজানা আতঙ্কে ভুগছেন, তাঁদের কাছে খাদ্যের পাশাপাশি এই বদলের খবরও পৌঁছে দেওয়া যুগে যুগে ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব হয়ে থেকেছে। গৃহবন্দী থাকলেও, মগজে কার্ফিউ চালাবেন না। বদল যদি হয়, তা আপামর খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে হোক, এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিদিন ৯টায় আপনাদের কাছে আমরা উপস্থিত হচ্ছি অডিও বা ভিডিও মারফত। মতামত জানাবেন। পথ আমিও জানি না, আপনিও জানেন না। মতামতই পারে আলোর দিশা দেখাতে। তাই আসুন, মতামত রাখি ও মতামত শুনি। প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে জর্জরিত করে চলেছে যেসব সমস্যাগুলো, সেগুলোর কথা তুলে ধরি। পথ খুঁজি সমাধানের। সমাজের সাথে বন্ধন আরও দৃঢ় হোক। দূরত্ব শুধু শারিরিক হয়েই থাকুক। মানুষের সামগ্রিক একতাই পারে দুর্লঙ্ঘ্য জয় করতে। তাই আসুন, আরও বেঁধে বেঁধে থাকি...